শিয়া পরিচিতি

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। প্রকাশকের কথা	৩
২। ফির্কা সৃষ্টির ভবিষ্যদ্বানী	৫
৩। ফির্কা সৃষ্টির ইতিকথা	৫
৪। প্রথম পর্ব ঃ (গোঁড়ার দিকে শিয়াদের ৪ শ্রেণী)	৭
৫। দ্বিতীয় পর্ব ঃ (ঘালি শিয়া বা চরমপন্থী শিয়ারা ২৪ উপদলে বিভক্ত ও তাদের আক্বিদা)	১০
৬। তৃতীয় পর্ব ঃ (ইমামিয়া শিয়ারা ৩৫ উপদলে বিভক্ত ও তাদের আক্বিদা)	১৬
৭। চতুর্থ পর্ব ঃ (শিয়াদের ১২টি ভ্রান্ত আক্বিদা)	২৩
৮। পঞ্চম পর্ব ঃ (ইসলামের প্রথম তিন খলিফা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর বিরূদ্ধে শিয়াদের অবমাননাকর উক্তি)	২৮
৯। ষষ্ঠ পর্ব ঃ (হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদা)	৩৮
১০। সপ্তম পর্ব ঃ (শিয়াদের পৃথক আচার অনুষ্ঠান ও পৃথক শরিয়তী বিধান)	৪০
১১। অষ্টম পর্ব ঃ (শিয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা)	৪৬
১২। নবম পর্ব ঃ (পবিত্র আহ্‌লে বাইত- এর ফযিলত)	৪৭
১৩। দশম পর্ব ঃ (আহ্‌লে বাইতের সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ হুযুরের বিবিগণ, সন্তানাদিও নিকটাত্মীয়রা আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভূক্ত কিনা?)	৫২
১৪। একাদশ পর্ব ঃ (শেষ কথা ঃ শিয়া আন্দোলনের ক্রমধারা, পাক ভারতে শিয়া প্রভাব, বর্তমান বাংলাদেশে শিয়া প্রচারনা)।	৬১

www.sunnibarta.com

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাছুলিহিল কারীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শিয়া পরিচিতি

ফির্কা সৃষ্টির ভবিষৎদ্বাণী ঃ (হাদীস)- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আমার উম্মত অচিরেই তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যাবে- তন্মধ্যে একটি ছাড়া বাকী বাহাত্তরটি জাহান্নামী হয়ে যাবে"। উক্ত বাহাত্তরের মধ্যে শিয়া ফির্কা একটি। শিয়া ফির্কা পূনঃ ৬৩টি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

ফির্কা সৃষ্টির ইতিকথা

ভূমিকা ঃ ইসলামে বিভিন্ন ফির্কার সৃষ্টি হয় খিলাফতে রাশেদা যুগের শেষের দিকে। ত্রিশ বৎসর খিলাফতকালের মধ্যে প্রথম পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত কোন ফির্কার অস্তিত্ব ছিলনা। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু শহীদ হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও অনৈক্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। হযরত ওসমান (রাঃ)- এর ১২ বৎসর খিলাফতের শেষ ছয় বৎসরে জনৈক ইয়াহুদী গুপ্তচর মুসলমান সেজে হযরত ওসমান (রাঃ)- এর খিলাফতের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানী দিতে থাকে। তার নাম আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সাবা। তার দেশ ইয়েমেনে। সানা শহরে ছিল তার আবাসভূমি। ইসলামী রাষ্ট্র তখন আরব ভূখন্ড ছেড়ে আফ্রিকা, ইউরোপের সাইপ্রাস, এশিয়া মহাদেশের পারশ্য, এশিয়া মাইনর ও চীন সীমান্ত পর্যন্ত এবং দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরবের চেয়ে অনারব মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশী। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মিশর, ইয়েমেন, কুফা, বসরা, খোরাসান- প্রভুতি অঞ্চলে ব্যাপক সফর করে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে হযরত ওসমানের খিলাফতের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। শুরু হয় ভূল বুঝাবুঝির। মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে বিদ্রোহ। এভাবে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবার প্রথম পরিকল্পনা সফল হলো। দুর্বল চিত্তের মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রথম বীজ এভাবেই বপন করতে সক্ষম হলো ইয়াহুদী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। কিন্তু সে রইলো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যেমনটি ঘটছে বর্তমানে-ইহুদী নাসারা ষড়যন্ত্রের বেলায়। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর খলিফা নিযুক্ত হন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত আলী (কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) -এর ক্ষমতা সুসংহত হওয়ার পূর্বেই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতের বিচার অনুষ্ঠানের দাবী তোলা হয় এবং উক্ত বিচার হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি আনুগত্য স্বীকারের পূর্বশর্ত

www.sunnibarta.com

হিসাবে আরোপ করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এ দাবীর পেছনে ইন্ধন জোগাতে শুরু করলো। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে মুনাফিকী চাল এঁটে সে হযরত আলী (রাঃ)-এর আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করলো। এ অবস্থায় ঘটে গেল দুঃখজনক দুটি ঘটনা। একটি হলো- জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ। দ্বিতীয়টি হলো জঙ্গে সিফ্ফিন বা সিফ্ফীনের যুদ্ধ। প্রথমটির নেতৃত্ব দেন মা আয়েশা (রাঃ) এবং দ্বিতীয়টির নেতৃত্ব দেন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)। এই দুই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুই বাতিল ফির্কার সূচনা হলো। একটির নাম "শিয়া ফির্কা"; দ্বিতীয়টির নাম "খারিজী ফির্কা"। শিয়া ফির্কা হযরত আলীর পক্ষে এবং খারেজীরা বিপক্ষে। তারা এমন সব জঘন্য আক্বীদার সৃষ্টি করলো- যার কোন ভিত্তি ইসলামে খুঁজে পাওয়া যায় না। খারিজী ফির্কার প্রথম প্রতারণামূলক শ্লোগান ছিল পবিত্র কুরআনের একটি পবিত্র বাণী- "ইনিল হুক্মু ইল্লা লিল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুমত ছাড়া অন্য কোন হুকুমত আমরা মানিনা"।

আল্লাহর কালামের মনগড়া ব্যাখ্যা করে খারিজীরা হযরত আলীর (রাঃ) খিলাফতকে অস্বীকার করে বস্লো। এই খারিজী দল যুগে যুগে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু ফিত্না সৃষ্টি করেছে। এই দলেই পয়দা হয়েছে ইবনে তাইমিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী (শামী, তারিখে নজদ ও হিজায)। বর্তমানকালে আবুল আ'লা মউদুদীকেও নব্য খারিজী ফির্কা বলে অভিহিত করেছেন দেওবন্দী উলামাগণ সহ সর্বস্তরের উলামা মাশায়িখগণ। এর বিস্তারিত বিবরণ শর্ষিনা থেকে প্রকাশিত "মউদুদী জামাতের স্বরূপ" (১৯৬৬ইং) পুস্তকে দেখা যেতে পারে।

শিয়া ফির্কা প্রথম দিকে কেবলমাত্র হযরত আলীর (রাঃ) স্বপক্ষের লোকদেরকেই বলা হতো। তাঁদেরকে বলা হতো শিয়া মুখলিসীন। এদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামগণও ছিলেন। তাঁদের কোন পৃথক আক্বীদা ছিল না। পরবর্তীতে হযরত আলীর (রাঃ) যামানাতেই শিয়াদের আর একটি শাখার সৃষ্টি হলো। এদেরকে বলা হতো তাফদীলিয়া শিয়া বা অন্য সাহাবীগণের উপর হযরত আলীর (রাঃ) শ্রেষ্ঠত্ব আরোপকারী শিয়া। এরপর সৃষ্টি হলো তৃতীয় শিয়া ফির্কা। এদের নাম হলো "ছাব্বাইয়া" ও "তাবার্রাইয়া" -যারা অন্য সাহাবীগণকে গালিগালাজ করতো। এই দলের নেতা সেজে বসলো ইহুদী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। এরপর সৃষ্টি হলো শিয়াদের চতুর্থ ফির্কা "ঘালী শিয়া" বা চরমপন্থী শিয়া।

এই ঘালী বা চরমপন্থী শিয়া পরবর্তীতে ৬৩ টি শাখা উপ-শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ইমামিয়া, ইস্মাঈলীয়া, ইস্না আশারিয়া ও কারামাতা শিয়াগণই বেশী পরিচিত ও জঘন্য আকিদায় বিশ্বাসী।

(সূত্র ঃ আল-মিন্হাতুল ইলাহিয়া-তালখিছু তারজামাতুত তুহফাতিল ইস্না আশারিয়া-কৃত আল্লামা সাইয়্যিদ মাহ্মুদ শিকরী ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ হুসাইনী আলূসী বাগদাদী ইবনে সাইয়্যিদ মাহ্মুদ আলূসী বাগদাদী, প্রণেতা-তাফসীরে রুহুল মাআনী। আল- মিনহাতুল ইলাহিয়া আরবী গ্রন্থটি অবলম্বন করেই শিয়া পরিচিতি রচনা করা হলো। (মূল কিতাব হলো "তোহ্ফায়ে ইস্না আশারিয়া")।

www.sunnibarta.com

প্রথম পর্ব

শিয়া ফির্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আক্বীদা ঃ

শিয়া সম্প্রদায়-যারা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু- এর স্বপক্ষীয় ও অনুসারী বলে দাবী করে এবং তাঁকে মহব্বৎ করে। তারা মূলতঃ চার ফের্কায় বিভক্ত। যথা ঃ

১। প্রথম যুগের আদি শিয়া বা মুখলিসীন শিয়া ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালের (৩৫-৪০ হিজরী) মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের অনুসারী তাবিয়ীনগণ এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁরা হযরত আলীর ন্যায্যপ্রাপ্য ও মর্যাদার স্বীকৃতিদাতা ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁরা অন্য কোন সাহাবীকে ছোট করে দেখানো কিংবা তাঁদেরকে গালিগালাজ করা বা কাফির মনে করা- ইত্যাদি দোষ ত্রুটি হতে সম্পূর্ন মুক্ত ছিলেন। কুরআনের ব্যাখ্যায় তাঁরা হযরত আলীকেই অনুসরণ করতেন। বাইআতুর রিদওয়ানের মধ্যে শরীক চৌদ্দশত সাহাবীর মধ্যে আটশত সাহাবীই সিকফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। তম্মধ্যে তিনশত সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। অবশ্য কোন কোন সাহাবী উক্ত যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে দূরত্বে রেখেছিলেন- শুধু সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য। তাঁরা এসব ঝামেলায় নিজেদেরকে জড়িত করেননি। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)।

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফ্ফীনে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই পরে হযরত আলী (রাঃ) -এর সাথে যোগদান না করার জন্য দুঃখও প্রকাশ করেছিলেন। শিয়া শব্দটি কখন থেকে প্রচলিত হয়- সে সম্পর্কে শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রহঃ) তোহ্ফা ইস্না আশারিয়া গ্রন্থে বলেন ঃ ৩৭ হিজরী সনে শিয়া বা "শিয়ীয়ানে আলী" শব্দটি প্রচলিত হয়। এই দলের কোন পৃথক মতবাদ বা নিজস্ব আক্বীদা ছিলনা। তাঁরা সর্ব বিষয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে অনুসরণ করতেন।

২। তাফ্দিলিয়া শিয়া ঃ এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়াগণ সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেশী ফযিলত বা মর্যাদা দিতেন বলে এই নামকরণ করা হয়। কিন্তু তাই বলে অন্য কোন সাহাবীকে গালি দেয়া বা কাফির বলা কিংবা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা- কোনটাই এঁদের মধ্যে ছিলনা। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম উল্যেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন আরবী নাহু বিদ্যার জনক আবুল আসওয়াদ দোয়ায়লী। তাঁর শাগরেদ আবু সাঈদ ইয়াহ্ইয়া, সালেম ইবনে আবু হাফ্সা (যিনি ইমাম বাকের (রাঃ) এবং ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) থেকে

www.sunnibarta.com

হাদীস বর্ণনা করেছেন), বিখ্যাত অভিধান "ইসলাহুল মানতিক" প্রণেতা আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক- প্রমূখ।

পরবর্তীকালের বিখ্যাত সুফী সাধক আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রহঃ)-এর গ্রন্থাবলীতেও তাফ্‌দিলী মতবাদের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এই তাফদিলী সম্প্রদায়ের প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রথম সম্প্রদায় মুখলিসীন শিয়াদের দুই কি তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৯ বা ৪০ হিজরী সনে।

বিশ্বস্ত বর্ণনামতে দেখা যায় যে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালেই টের পেয়েছিলেন যে, কিছু কিছু লোক তাঁকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) -এর উপরে মর্যাদা দিচ্ছেন। সাথে সাথে তিনি এ আক্বীদা পোষণ করা থেকে বারণ করেন এবং বলেন-"যদি আমি কারও মুখে একথা শুনি যে, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের উপর আমাকে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে- তাহলে আমি তাকে আশি দোর্‌রা মারবো"। কোন কোন বর্ণনায় দশ দোর্‌রার কথা উল্লেখ আছে।

৩। ছাব্বাইয়া বা তাবাররাইয়া শিয়া ফির্কা ঃ এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়াগণ সালমান ফারসী, আবুযার গিফারী, মিক্‌দাদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)- প্রমূখ সাহাবীগণ ব্যতিত অন্য সব সাহাবীগণকেই গালিগালাজ দিয়ে থাকে। এমনকি- তারা উক্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সব সাহাবীকেই কাফির ও মুনাফিক বলে বিশ্বাস করে এবং গালিগালাজ করে থাকে। তারা একথাও বলে যে, বিদায়ী হজ্জ সমাপন করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে হযরত আলী (রাঃ) -এর সম্পর্কে বলেছিলেন- "আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা"।

তারা মনে করে- নবী করিম (দঃ) এই ভাষণের দ্বারা হযরত আলীকেই তাঁর পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করে গেছেন। সুতরাং পরবর্তীকালে ঐ সময়ে উপস্থিত সাহাবীগণ হুযুরের ইনতিকালের পর না কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হযরত আলীকে খলিফা নির্বাচিত না করে বরং হযরত আবু বকর সিদ্দিকের হাতে বাইয়াত করে সকলেই মুর্‌তাদ শ্রেণীর কাফির হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় হযরত আলীর খিলাফতকালেই। ইয়েমেনের সানা প্রদেশবাসী কুখ্যাত ইহুদী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা- এর কুমন্ত্রণা ও উস্কানীতে এই বদ আক্বীদার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে সোয়াইদ নামক জনৈক ব্যক্তি হযরত আলীর খিদমতে এসে বললেন যে, আমি একটি সম্প্রদায়কে দেখেছি- "তারা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমরকে (রাঃ) গালমন্দ করছে। আপনি হয়তো অন্তরে অন্তরে এ ধারণা পোষণ করেন বলেই তারা এই প্রকাশ্য গালমন্দের দুঃসাহস দেখাচ্ছে"। একথা শুনেই হযরত আলী (রাঃ) লজ্জায় নাউযুবিল্লাহ বলে আমাকে নিয়ে কুফার মসজিদে প্রবেশ করে সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ ভাষণে বললেনঃ "কত হতভাগা ঐ সব লোক- যারা

www.sunnibarta.com

নবী করিম (দঃ)-এর উযির ও সাহাবী, কুরাইশ সর্দার ও মুসলমানদের পিতৃতুল্য দুই সাহাবী সম্পর্কে কটুক্তি করছে। আমি এসব লোকের সংস্পর্শেও নেই। তাঁরা উভয়ে আজীবন রাসুলে পাকের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। ইনতিকালের সময় পর্যন্ত তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠায় তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা দিয়ে তাঁরা নবী করিম (দঃ) কে সাহচর্য্য দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি ভালবাসাই ইবাদত তুল্য এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাই ঈমান থেকে খারিজ হওয়ার সমতুল্য"।

এ কথা বলেই তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা- এর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ইরাকের মাদায়েনে গিয়ে আত্মগোপন করে। এই ছাব্বাইয়া গোত্রের শিয়ারা প্রথম শ্রেণীর শিয়াদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে প্রতারণা করে নিজেদের নাম রাখে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত"। এটা ছিল তাদের আত্মরক্ষার ধোঁকাবাজী ও প্রতারণামূলক কাজ। আজকালও দেখা যায় যে, কোন সম্প্রদায় ওহাবী বা দেওবন্দী অথবা মওদুদী বলে পরিচিত হয়ে গেলে তারা নিজেদেরকে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত" বলে আত্ম পরিচয় দেয় এবং ঐ নামে প্রতারণামূলক প্যারালাল সংগঠনও দাঁড় করে ফেলে। এটা তৃতীয় শ্রেণীর শিয়াদের মতই প্রতারণামূলক কাজ- (লেখক)। আমাদের দেশে চুনকুটির সদর উদ্দীন চিশ্‌তী ও তার অনুসারীরা ছাব্বাইয়া শিয়াদের অনুসারী। এরা খুবই জঘন্য মুনাফিক।

৪। ঘালী বা চরমপন্থী শিয়া ঃ এই ফির্কার শিয়াদের উদ্ভব হয় হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালেই। ইহুদী চর আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা- এর ইঙ্গিতেই এই শাখার সৃষ্টি হয়। এই চরমপন্থী শিয়াদের আক্বীদা ও বিশ্বাস হলো- "হযরত আলী-ই-খোদা" (নাইযুবিল্লাহ)। এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিল ইব্‌নে আবিল হদিস নামীয় জনৈক কবি। এই আক্বীদাপন্থীর পরিচয় পেলে হযরত আলী (রাঃ) সাথে সাথেই তাকে কতল করে ফেলতেন। এই শেষোক্ত ফির্কার লোক যদিও পূর্বের তিনটি দলের তুলনায় কম ছিল- তবু তারা পরবর্তীকালে চব্বিশটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে (সুত্রঃ তোহফা ইস্‌না আশারিয়া- শাহ আব্দুল আজিজ)।

www.sunnibarta.com

দ্বিতীয় পর্ব

ক্রমিক ৪-এর ঘালী বা চরমপন্থী শিয়াদের শ্রেণী বিভাগ ঃ (২৪)

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থ ফির্কার শিয়াদেরকে ঘালী বা চরমপন্থী শিয়া বলা হয়। এরা পুনরায় চব্বিশটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মূল আক্বীদা হলো- "হযরত আলী-ই খোদা" (নাউযুবিল্লাহ)। এই আক্বীদার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তাদের মধ্যে এই ২৪টি উপ-শাখার সৃষ্টি হয়েছে। সংক্ষেপে তাদের ইতিবৃত্ত ও আক্বীদা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। সাবাইয়্যা শিয়া ঃ এরা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইহুদী চরের অনুসারী। চরমপন্থী এই শিয়া গ্রুপের আক্বীদা হলো- "হযরত আলী-ই খোদা"। হযরত আলী শাহাদত বরণ করার পর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা প্রচার করে যে, "তিনি মরেননি- ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মূলজেম হযরত আলীকে শহীদ করতে পারেনি- বরং একটি শয়তান হযরত আলীর সুরত ধারণ করেছিল। ইবনে মূলজেম তাকেই হযরত আলী মনে করে কতল করেছে। ঐ সময় হযরত আলী আকাশের মেঘ মালায় লুকিয়ে যান এবং বর্তমানের মেঘের গর্জন হযরত আলীরই গর্জন। মেঘের বিদ্যুৎ হচ্ছে হযরত আলীর তরবারী বা কোড়া। তিনি পৃথিবীতে আবার নেমে আসবেন এবং তাঁর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন"।

এ কারণেই চরমপন্থী এই শিয়া গ্রুপ মেঘের গর্জন শুনলেই বলে উঠে "আলাইকাছ্ ছালাম আইয়ুহাল আমীর" অর্থাৎ হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার উপর ছালাম বর্ষিত হোক। তাদের এ কুধারণা কুসংস্কারেরই ফলশ্রুতি। তাদের ধারণা মতে যদি সত্যি সত্যি হযরত আলী (রাঃ) মেঘ মালায় লুকায়িত থাকতেন, তাহলে এখনই তাঁর শত্রুদের নিপাত করতেও সক্ষম হতেন। এত দীর্ঘ প্রতীক্ষার কি প্রয়োজন? (তোহ্ফা ইসনা আশারিয়া)।

২। মুফাদ্দালিয়া শিয়া ঃ চরম পন্থী শিয়াদের দ্বিতীয় শাখা হলো মুফাদ্দাল সাইরাফী নামক নেতার অনুসারী দল। প্রথম শাখার আক্বীদা তো এরা পোষণ করেই- তদুপরি আর একটু অগ্রসর হয়ে তারা বলে- "হযরত আলীর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে ঐরূপ- যেরূপ সর্ম্পক ছিল আল্লাহর সাথে ইছা নবীর (আঃ)"।

এদের আক্বীদা আর খৃষ্টানদের আক্বীদা এক। আল্লাহ ও বান্দাকে তারা এক মনে করে। তাদের আরো বিশ্বাস- নবুয়ত ও রিসালাতের ধারা খতম হয়ে যায়নি। যেসব বুযর্গের সাথে লাহুতি জগত (উর্দ্ধজগত) সম্মিলিত হয়, তাঁরা হলেন নবী। এই

www.sunnibarta.com

নবীগণ যখন মানুষকে হিদায়াতের আহ্বান জানান, তখন তাঁদেরকে বলা হয় রাসুল। এই চরমপন্থী মুফাদ্দালিয়া গ্রুপ থেকেই অতীতে নবুয়ত ও রিসালাতের ভন্ড দাবীদারদের উদ্ভব হয়েছিল। বর্তমানে কাদিয়ানী গ্রুপ এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাছেম নানুতবীও কুরআনের খতমে নবুয়ত সংক্রান্ত আয়াতটির এভাবে অর্থ করেছে- "তিনি নবীগণের ভূষণ ও আফযল নবী- তাঁকে শেষ নবী মনে করা জাহেলদের কাজ" (তাহ্যীরুন্নাছ)।

৩। ছারিগীয়া শিয়া ঃ এই গ্রুপ ছারিগ নামক শিয়া নেতার অনুসারী। দ্বিতীয় মুফাদ্দালিয়া গ্রুপ এবং এই তৃতীয় গ্রুপের মতবাদ প্রায় একইরূপ। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দ্বিতীয় গ্রুপের মতে যে কোন বুযুর্গের মধ্যেই আল্লাহ হুলুল (প্রবেশ) করতে পারেন। কিন্তু ছারিগীয়ারা এই হুলুল বা প্রবেশ নিম্নলিখিত পাঁচজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করে। তাঁরা হলেনঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, হযরত আব্বাছ, হযরত আলী, তাঁর দুই ভাই হযরত জাফর ও হযরত আকিল (রাঃ)।

৪। বাজিইয়া শিয়া ঃ চরমপন্থী ঘালী শিয়াদের চতুর্থ দল হলো বাজিইয়া গ্রুপ। বাজি ইবনে ইউনুছ নামের এক শিয়া নেতার অনুসারী এরা। এদের আক্বীদা হচ্ছেঃ "শুধুমাত্র ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)-এর মধ্যেই খোদায়ীত্ব প্রবেশ করেছে- অন্য কারও মধ্যে নয়। তাদের মতে- আল্লাহ্ তায়ালা এক ব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছেন মাত্র। তবে তিনি দেহধারী নহেন"। তারা বলে- "ইমাম জাফর সাদেকের পর অন্য কোন শিয়া ইমাম খোদা হতে পারবেন না। তবে তাদের নিকট ওহী অবতীর্ণ হবে এবং তাদের মেরাজও সংঘটিত হতে পারে"।

৫। কামিলিয়া শিয়া গ্রুপ ঃ আবু কামিল নামক জনৈক শিয়া নেতার অনুসারী এই দল। এজন্য তাদেরকে কামিলিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়। এদের চরমপন্থী আক্বীদা হচ্ছে "আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে প্রবেশ করতে পারে। কোন দেহ মরে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে তার আত্মা অন্য দেহ ধারণ করতে পারে"। তাদের ধারণা মতে "আল্লাহ্র পবিত্র আত্মা প্রথমে আদমের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে শীশ পয়গাম্বরের মাধ্যমে অন্যান্য নবীগণের মধ্যেও আল্লাহর পবিত্র আত্মা স্থানান্তরিত হয়েছে"। তারা বলে- "যেসব সাহাবা হযরত আলীর খিলাফত স্বীকার করেননি- তারা সবাই কাফির এবং হযরত আলীও কাফির- কেননা তিনি তাঁর ন্যায্য অধিকার দাবী করেননি" (নাউযুবিল্লাহ্)।

এরা অভিমানী ও হতাশ প্রেমিক শিয়া। নেতার উপর অভিমান করেই তারা নেতার বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া জারি করে বসে আছে।

৬। মুগীরিয়া শিয়া ঃ এই চরমপন্থী শাখাটি হলো মুগীরা ইবনে সাঈদ আজারীর অনুসারী। এদের আক্বীদা নিম্নরূপঃ (ক) আল্লাহ্ স্বশরীরী স্বত্তা। আল্লাহ্র আকার একজন পুরুষের আকারের মত। তাঁর মাথায় নূরের টুপী আছে। তাঁর ক্বলব আছে।

www.sunnibarta.com

সেখান থেকেই যাবতীয় হিকমত উৎসারিত হয়ে থাকে। (খ) শয়তান হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরকে কুফরী করার পরামর্শ দিলে তাঁরা শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী কুফরী করে বসে। তখন শয়তান এই বলে বিদায় নেয় ''আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলাম''। এই মুগীরিয়া শিয়াদের মতে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের কুফরী প্রসঙ্গেই নাকি কুরআনের নিম্ন আয়াতটি নাজিল হয় মাছালুহুম কামাছালিশ শাইতন, ইজ ক্বলা লিল ইনছানিকফুর, ফালাম্মা কাফারা ক্বলা ইন্নী বারিউম মিনকা" অর্থাৎ - "তাদের উপমা হলো শয়তানের ন্যায় - যখন সে কোন মানুষকে বলে - তুমি কুফরী কর। যখন সে কুফরী করে বসে - তখন শয়তান বলে- আমি তুমা হতে বিমুখ হলাম''। (গ) হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পুত্র ইমাম হাসানের প্রপৌত্র মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হচ্ছেন ভবিষ্যতের প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী। পর্বতমালায় এখনও অবস্থান করছেন।

৭। জানাহিয়া শিয়া: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ভাই শহীদ জাফর তাইয়ারের পুত্র আবদুল্লাহর নাতী - আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়ার অনুসারী এই দল। জাফর তাইয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উপাধী ছিল "জুল জাহানাঈন''। তারা এজন্য তাদের পরিচিতি হিসেবে জানাহিয়া শিয়া বলে প্রচার করে। এদের আক্বীদা পঞ্চম দলের অনুরূপ: অর্থাৎ আত্মার স্থানান্তরে এরা বিশ্বাসী। তারা বলে - "আল্লাহর আত্মা নবীগণ হয়ে হযরত আলী ও তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে এসে সমাপ্ত হয়েছে। এ ধারা পূণরায় হযরত আলীর ভাই জাফর তাইয়ারের বংশে আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়ার মধ্যে স্থান লাভ করেছে। তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, বরং ইস্পাহানের একটি পাহাড়ে জীবিত অবস্থান করছেন''। এই চরমপন্থীরা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং সব মৃতজন্তু ও অন্যান্য হারাম বস্তুকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। (উল্লেখ্য - অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হারামকে হালাল মনে করা কুফরী)

৮। বয়ানিয়া শিয়া: চরমপন্থী শিয়াদের অষ্টম গ্রুপের নাম বয়ানিয়া। নজদের বনু তামীমের বয়ান ইবনে ছামআন - এর অনুসারী এই দল। এদের ধারণামতে - ''আল্লাহ তায়ালা একজন মানুষের আকৃতিধারী এবং আল্লাহর আত্মা প্রথমে হযরত আলীর মধ্যে, তারপর তাঁর অন্য স্ত্রীর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়ার মধ্যে, তারপর তার পুত্র আবু হাশেমের মধ্যে প্রবেশ করেছে''। এরা মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়াকে ইমাম মানে - ইমাম হাসান ও হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে মানেনা।

৯। মনসুরিয়া শিয়া: আবু মনসুর আজালীর অনুসারীদেরকে মনসুরিয়া শিয়া নামে অভিহিত করা হয়। এদের আক্বীদা হচ্ছে: ''রিছালাতের দরজা বন্ধ হবে না। শরীয়তের বিধি বিধান সবই উলামা ও ফক্বিহগণের মনগড়া। বেহেস্ত- দোযখ বলতে কোন বস্তু নেই''। ইমাম বাকের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পর তাদের ইমাম হচ্ছেন আবু মনসুর।

১০। গামামিয়া শিয়া ঃ এদের আক্বীদা হচ্ছে- আল্লাহ্ তায়ালা বসন্তকালে মেঘ মালায় ভর করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে পুনরায় আকাশে আরোহন করেন। এ কারণেই বসন্ত মৌসুমে পৃথিবী ধনধান্যে, ফুলেফলে সুশোভিত হয়ে উঠে।

১১। তাফভিজিয়া শিয়া ঃ এদের আক্বীদা ও বিশ্বাস হচ্ছেঃ "আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করে তাঁর হাতে সৃষ্টির ভার অর্পন করেছেন। তিনি নিজে হচ্ছেন পৃথিবীর অবশিষ্ট বস্তুরাজীর মহা স্রষ্টা"।

এদের কেউ কেউ আবার হযরত আলীকে পৃথিবীর স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। আবার কেউ বিশ্বাস করে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আলীকে যৌথভাবে পৃথিবী সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে"। একারণেই তাদেরকে তাফভিজিয়া শিয়া বলা হয়। তাফভিজ অর্থ- নিজের ক্ষমতা অন্যের উপর ন্যাস্ত করা।

১২। খাত্তাবিয়া শিয়া ঃ চরমপন্থী শিয়াদের এই দলের নেতা হলো আবুল খাত্তাব আসাদী। এদের আক্বীদা হচ্ছে-

"নবীগণ হলেন প্রকৃত ইমাম এবং আবুল খাত্তাব একজন নবী। অন্যান্য নবীগণ- আবুল খাত্তাবের আনুগত্য করাকে মানুষের উপর ফরয করে দিয়েছেন"। আর এক কদম অগ্রসর হয়ে এরা বলে- "সমস্ত ইমামগণই খোদা। ইমাম হাসান-হোসাইনের পুরুষ সন্তানগণ সকলেই আল্লাহ্র সন্তান ও প্রিয়। ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) খোদা। তাদের নেতা আবুল খাত্তাব হযরত আলী এবং ইমাম জাফর সাদেকের চেয়েও উত্তম"।

এরা এদের স্বপক্ষীয় লোকদের পক্ষে এবং বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষ্য প্রদানকে বৈধ মনে করে। তাদের নেতা নিহত হওয়ার পর এরা কয়েক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক গ্রুপ বলে- "আবুল খাত্তাবের পর মা'মার তাদের ইমাম"। আল্লাহ্র ইবাদতের ন্যায় তারা মা'মার- এর ইবাদত শুরু করে দেয়। তাদের মতে- "দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও অন্যান্য নেয়ামত সমূহই বেহেস্ত এবং অমঙ্গল ও মুসিবত সমূহই দোযখ"। এরা হারাম বস্তুকে হালাল মনে করে এবং ফরয সমূহ বর্জন করে। তাদের অন্য গ্রুপের দাবী হলো- আবুল খাত্তাবের হত্যার পর বাজি' নামক ব্যক্তি তাদের- ইমাম। তাদের বিশ্বাস ঃ "প্রত্যেক মুমিনের নিকটই ওহী আসে"। তাদের তৃতীয় গ্রুপের ধারণা- "আবুল খাত্তাবের পর তাদের ইমাম ওমর ইবনে বয়ান আজালী"। (আমাদের দেশের কিছু ভন্ড ফকির তাদের অনুসারী)।

১৩। মা'মারিয়া শিয়া ঃ এ দল আবুল খাত্তাবের পর মা'মারকে তাদের নেতা বলে বিশ্বাস করে এবং শরীয়তের যাবতীয় আইন কানুন তার উপর সোপর্দ- বলে আক্বীদা পোষণ করে। এরা বলে- "ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) ছিলেন নবী- তারপর নবী

www.sunnibarta.com

ছিলেন আবুল খাত্তাব- এরপর তাদের নেতা মা'মার হচ্ছেন শেষ নবী। তিনি যাবতীয় বিধি নিষেধ তুলে দিয়েছেন এবং শরীয়তের বাধ্যবাধকতা রহিত করেছেন"। এরা মূলতঃ দ্বাদশ (ইসনা আশারিয়া) গ্রুপেরই একটি উপশাখা মাত্র।

১৪। গোরাবিয়া শিয়া ঃ এই চরমপন্থী শিয়াদের নামকরণ হয়েছে "গোরাব" বা কাক শব্দ থেকে। এদের দৃঢ় বিশ্বাস- "এক কাক যেমন আর এক কাকের সদৃশ, এক মাছি আর এক মাছির সদৃশ- তদ্রূপ শারিরীক গঠনে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আন্হু ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদৃশ। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিবরাইলকে হযরত আলীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। শারিরীক গঠনের সাদৃশ্যের কারণে জিব্রাইল ভুল করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিকট রিছালাতের দায়িত্ব অর্পন করে ফেলেছেন"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

এ কারণেই গোরাবিয়া শিয়া সম্প্রদায় হযরত জিব্রাইলকে অভিসম্পাত (লানত) দিয়ে থাকে। তাদের এক কবি বলেনঃ "জিব্রাইল আমীন গলদ করে রিছালাতকে আলী হায়দার থেকে অন্যত্র নিয়ে গেছেন"। (হযরত গাউসুল আযম (রাঃ) গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে এদেরকে ইসলামের ইয়াহুদী সম্প্রদায় বলেছেন- লেখক)।

১৫। জুবাবিয়া শিয়া ঃ জুবাব অর্থ-মাছি। এক মাছি অন্য মাছির সদৃশ। তারা বলে- "হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহ-সদৃশ। তবে তিনি নবী ছিলেন"।

আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুক। জুবাব বা মাছির সাদৃশ্যতার উপমা নবী ও আল্লাহ্র ক্ষেত্রে জুড়ে দেয়ার কারণে এই চরমপন্থী শিয়াদেরকে জুবাবিয়া শিয়া বলা হয়।

১৬। যাম্মিয়া শিয়া ঃ 'যাম্মুন' আরবী শব্দ। অর্থ হলো- বদনাম আরোপ করা। এই সম্প্রদায়ের শিয়াগণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর এই অপবাদ আরোপ করে যে, "হযরত আলী হচ্ছেন খোদা এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দিকে লোকদেরকে আহ্বান করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা না করে নিজের জন্যই, আল্লাহ্ বলে দাবী করে বসলেন"।

তাদের মধ্যে সমঝোতা স্বরূপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আলী (রাঃ) উভয়কেই আল্লাহ্ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। তবে এক নম্বর আর দুই নম্বর নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ থেকে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাকপাঞ্জাতন (মুহাম্মাদ (দঃ), আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইনকে) খোদা বলে বিশ্বাস করে। (নাউযুবিল্লাহ্)।

www.sunnibarta.com

১৭। ইস্‌নাইনিয়া শিয়া ঃ এরা যাম্মিয়া গ্রুপের উপশাখা। তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাম্মিয়াদের তফ্‌সিল মতে আল্লাহ্ বলে আক্বীদা পোষণ করে। তারা যাম্মিয়াদের দ্বিতীয় উপশাখা বলে ইস্‌নাইনিয়া নামে খ্যাত।

১৮। খাম্‌ছিয়া শিয়া ঃ এরা যাম্মিয়াদের তৃতীয় উপশাখা। এরা পাক পাঞ্জাতনকে ইলাহ্ বা আল্লাহ্ বলে স্বীকার করে। এজন্য এদের পৃথক নামকরণ করা হয়েছে খাম্‌ছিয়া বা পঞ্চ খোদায় বিশ্বাসী।

১৯। নাসিরিয়া শিয়া ঃ এই চরমপন্থী শিয়াদের অপর নাম আলভী শিয়া। এরা সিরিয়ার হিম্‌স, হলব ও উত্তর সিরিয়ায় বসবাস করে। এদের আক্বীদা হচ্ছে- "আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যে প্রবেশ করেছেন"। তবে এরা আল্লাহ্ অর্থে আমীরকে রূপক হিসাবে বুঝায়।

২০। ইস্‌হাকিয়া শিয়া ঃ ইস্‌হাক নামীয় জনৈক শিয়া নেতার অনুসারী এই দলটি। এরা বলে- "এই পৃথিবী অতীতে কখনও নবী থেকে শুন্য ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও শুন্য থাকবেনা। আল্লাহ্- হযরত আলীর মধ্যে আছেন"। (কাদিয়ানীরাও একথাই বলে)।

২১। ইল্‌বাইয়া শিয়া ঃ ইল্‌বা ইব্‌নে আরওয়া আসাদীর অনুসারীগণকে ইল্‌বাইয়া শিয়া বলা হয়। এদের মতে "হযরত আলী (রাঃ) হলেন খোদা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।" (নাউযুবিল্লাহ্)।

২২। রাজ্‌জামিয়া শিয়া ঃ এই সম্প্রদায় মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়া, তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ- এর পুত্র আলী, তার পুত্র আবুল মনসুর কে ইমাম বলে মান্য করে। এরা ইতিহাস খ্যাত আবু মুসলিম খোরাসানীকে খোদা বলে স্বীকার করে। হারামকে হালাল বলে স্বীকার করা এদের আক্বীদা। (আবু মুসলিম খোরাসানী আব্বাসীয় হুকুমত প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছিল- লেখক)।

২৩। মুকান্নাইয়া শিয়া ঃ ইমাম হোসাইন (রাঃ)- এর পর মুকান্নাকে এরা খোদা বলে স্বীকার করে।

২৪। ইমামিয়া শিয়া ঃ "ইমামত" মতবাদে বিশ্বাসী বলে এদেরকে ইমামিয়া শিয়া বলা হয়। এদের বিশ্বাস- "নবুয়াত ও রিসালাত"- এর মধ্যে হযরত আলী নবী করিম (দঃ)- এর সাথে অংশীদার। এই ফির্কা খিলাফতে বিশ্বাসী নয়। এরা বলে- হযরত আলী (রাঃ) নবী করিম (দঃ) কর্তৃক তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়েছিলেন- কিন্তু হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফত বা নির্বাচন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জনগণের রায়ে খলিফা হয়ে যান। তাদের মতে ইমামত বা ঐশী মনোনয়নই ইসলামের সঠিক পদ্ধতি- খিলাফত হলো প্রতারনা মূলক নির্বাচন পদ্ধতি। (দেখুন- "মাওলার অভিষেক"বইটি)। এই ফির্কাটি পুনরায় ৩৫ টি উপদলে বিভক্ত।

www.sunnibarta.com

তৃতীয় পর্ব

ইমামিয়া শিয়া বা ইমামপন্থী শিয়াদের ৩৫ টি উপদল ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম যুগে শিয়াগণ মূলতঃ ৪টি গ্রুপে বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তারা হলো (১) মুখ্‌লিসীন (২) তাফ্‌দীলিয়া (৩) ছাব্বাইয়া (৪) ঘালিয়া। চতুর্থ গ্রুপটি হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে কোন না কোন প্রকারে খোদায়িত্ব আরোপ করতো। এরা চরমপন্থী। এরা পরবর্তীতে চব্বিশটি (২৪) উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে- যা এই মাত্র আলোচনা করা হয়েছে। তাদের শেষোক্ত দলটির নাম ইমামিয়াপন্থী শিয়া। এই ঘালি উপদলটি পরবর্তীকালে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে পুণরায় ৩৫টি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। বক্ষমান আলোচনায় তাদের শ্রেণী বিন্যাস ও আক্বীদা বিশ্বাস পর্যালোচনা করা হলো।

১। হাসানী শিয়া ঃ এই উপদলটি ইমামিয়া শাখার একটি দল। এদের আক্বীদা হলো- "হযরত আলীর পর ইমামত বা নেতৃত্ব শুধু হযরত ইমাম হাসান ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইমাম হোসাইন (রাঃ) অথবা তাঁর বংশধরগণের মধ্যে কেউ এ পদের মালিক নন"। এদের বিশ্বাস মতে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হাসান তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। ক্রমান্বয়ে এই ধারা তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র মোহাম্মাদ নাফ্‌ছে যাকিয়া ও ইব্রাহীম পর্যন্ত চালু ছিল। শেষোক্ত দু'জন আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর- এর যুগে আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহাদাত বরণ করেন। আরব ও আজমে তাদের অনুসারী ছিল প্রচুর। আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন সোচ্চার। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) নাফ্‌ছে যাকিয়াকে গোপনে সহযোগিতা করতেন। তাঁদের শাহাদতের অনেক পরে ১৯৫ হিজরী সনে হাসানী শিয়া গ্রুপটির সৃষ্টি হয়। এরা উপরোক্ত ছয় জনের ইমামতে বিশ্বাসী। এটা তাদের মনগড়া আক্বীদা- যা পরবর্তী যুগে গড়ে উঠেছে।

২। হাকামিয়া শিয়া ঃ হিশাম ইবনে হাকাম নামীয় শিয়া নেতার অনুসারীগণকে হাকামিয়া শিয়া বলা হয়। এদের চরমপন্থী আক্বীদা হলো- "ইমাম হাসান (রাঃ)- এর পর ইমাম হোসাইন, ইমাম জয়নুল আবেদিন, ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) পর্যন্তই ইমামতের পদ সমাপ্ত। এরপর আর কোন ইমাম নেই"। এ প্রশাখার সৃষ্টি হয় ১০৯ হিজরীতে।

৩। ছালিমিয়া শিয়া ঃ হিশাম ইবনে ছালিম নামের শিয়া নেতার অনুসারীরা ছালিমিয়া শিয়া নামে পরিচিত। ইমামদের ক্ষেত্রে হাকামিয়া প্রশাখার আক্বীদা পোষণ করলেও

www.sunnibarta.com

এরা আক্বীদাগত দিক থেকে পৃথক। হাকামিয়া প্রশাখার আক্বীদা হচ্ছে- "আল্লাহ্ তায়ালা দীর্ঘ দেহধারী- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা বিশিষ্ট এক মহান সত্ত্বা"। কিন্তু ছালিমিয়া শিয়াদের বিশ্বাস হচ্ছে- "মানুষের আকৃতিতেই আল্লাহ্ আকৃতি ধারণকারী এক সত্ত্বা"। ১১৩ হিজরীতে এদের উদ্ভব হয়।

৪। শয়তানিয়া বা নোমানিয়া শিয়া ঃ মোহাম্মাদ ইব্নে নোমান ছায়রাফী নামের নেতার অনুসারীদেরকে শয়তানিয়া শিয়া বলা হয়। কেননা, মোহাম্মাদ ইবনে নোমানের উপাধী ছিল "শয়তানুত তাক"। অবশ্য শিয়ারা তাকে বলতো- "মোমেনুত তাক"। এই দল ইমামতের ক্ষেত্রে ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)- এর ছেলে ইমাম মুছা কাযেম (রাঃ) পর্য্যন্ত ইমাম স্বীকার করে। ছালিমিয়া গোত্রের ন্যায় এরা আল্লাহ্কে মানুষের রূপে আকৃতি ধারণকারী এক সত্ত্বা বলে বিশ্বাস করে। এদের জন্ম হয় ১১৩ হিজরীতে।

৫। জারারিয়া শিয়া ঃ ১৪৫ হিজরীতে এই নূতন শিয়া ফির্কার সৃষ্টি হয়। কুফার অধিবাসী জারার ইব্নে আউন নামের জনৈক শিয়া এই দলের নেতা। হাকামিয়া শিয়াদের ন্যায় এরা ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) পর্যন্ত ইমাম মান্য করে। এই দল আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী বা ছিফাত সমূহকে অবিনশ্বর (কাদীম) বলে স্বীকার করে না- বরং নশ্বর বা পরিবর্তনশীল (হাদেছ) বলে মনে করে। আদিতে আল্লাহ্র ছিফাত ছিল না- পরে হয়েছে বলে এদের ধারণা।

৬। বাদাইয়া শিয়া ঃ এরা প্রথম ছয়জন ইমামকে মানে (হযরত আলী, হাসান, হোসাইন, জয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও জাফর সাদেক)। এদের ধারণা- আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটি সৃষ্টি করে পরে মুছলিহাতের পরিপন্থী মনে করে কখন কখনও লজ্জিত হন। যেমন ইসলামের প্রথম তিন খলিফা নির্বাচিত করে পরে আল্লাহ্ তায়ালা লজ্জিত হয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্)। এদের জন্ম ১৪৫ হিজরী সনে।

৭। মুফাউওয়াজা শিয়া ঃ এরাও ছয় ইমামে বিশ্বাসী। এদের আক্বীদা হচ্ছে- "আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে দুনিয়া সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পন করে দিয়েছেন"। তাদের কেউ কেউ আবার হযরত আলী (রাঃ)- এর উপর সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পনের কথা বিশ্বাস করে। আবার কেউ কেউ বলে- রাসুলুল্লাহ (দঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) উভয়ের উপরই যৌথভাবে পৃথিবী সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এদের জন্ম ১৪৫ হিজরীতে।

৮। ইউনুছিয়া শিয়া ঃ ইরানের কুম শহরের বাসিন্দা ইউনুছ ইবনে আবদুর রহমান নামীয় জনৈক শিয়া নেতার অনুসারী এই দল। এরাও ছয় ইমামে বিশ্বাসী। আল্লাহ্ সম্পর্কে এদের বিশ্বাস হচ্ছে- "আল্লাহ্ তায়ালা প্রকৃত ও শাব্দিক অর্থেই আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং ফেরেস্তাগণ উক্ত আরশ ধারণ করে আছে"।

www.sunnibarta.com

৯। বাকেরিয়া শিয়া ঃ এই দলের বিশ্বাস- "ইমাম বাকের (রাঃ) ইনতিকাল করেননি। বরং তিনি ভবিষ্যতে পুণঃ আত্মপ্রকাশ করবেন"।

১০। হাজেরিয়া শিয়া ঃ হাজের একটি পাহাড়ের নাম। একদল শিয়ার আক্বীদা হচ্ছে- "ইমাম বাকের (রাঃ)- এর অপর এক পুত্র যাকারিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত। ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) নহেন। এই যাকারিয়া হাজের নামক পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছেন। নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন না"।

১১। নাউছিয়া শিয়া ঃ বসরার অধিবাসী আবদুল্লাহ ইবনে নাউছ নামীয় জনৈক ব্যক্তির অনুসারী দলকে নাউছিয়া বলা হয়। এরা বিশ্বাস করে- "ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) এখনও জীবিত এবং আত্মগোপনকারী। ভবিষ্যতে তিনিই ইমাম মাহ্দী রূপে আবির্ভূত হবেন"।

১২। আম্মারিয়া শিয়া ঃ আম্মার নামের নেতার অনুসারী এই দল। এদের ধারণা নাউছিয়া শিয়াদের বিপরীত। এদের মতে- "ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) ইনতিকাল করেছেন। তাঁর পরে ইমাম হচ্ছেন তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ।" ১৪৫ হিজরীতে (৭ ও ৮ নম্বর শিয়াদের সমসাময়িক কালে) এই দলের সৃষ্টি হয়।

১৩। মুবারকিয়া শিয়া ঃ এই দলটি মুবারকের অনুসারী। এরা ইসমাইলী গোত্রেরই একটি শাখা। এদের বিশ্বাস মতে- "ইমাম জাফর সাদেকের (রাঃ) বড় ছেলে ইসমাইল তাঁর স্থলাভিষিক্ত। এরপর অপর ছেলে মোহাম্মদ হলেন ইমাম"। এদের মতে- উক্ত মোহাম্মদ হলেন প্রতীক্ষিত ইমাম মাহ্দী।

১৪। বাতিনিয়া শিয়া ঃ শিয়াদের এ উপদলটি কোরআন মজিদের প্রকাশ্য অর্থ মতে আমল করে না। এদের আক্বীদা মতে- কোরআনের বাতিনী অর্থের উপরই আমল করা ওয়াজিব। এরা ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)- এর পর তাঁর বড় ছেলে ইসমাইল এবং তার বংশধরগণকেই ইমাম বলে মান্য করে।

১৫। ইসমাইলী কারামাতা শিয়া ঃ ইসমাইলী পন্থী শিয়াদেরই একটি অতি উগ্র দল হলো কারামাতা শিয়া। কুফার অধিবাসী কারামাত নামীয় শিয়া এই দলের নেতা। ২৭০ হিজরী সালে এই ইসমাইলী কারামাতা শিয়ার সৃষ্টি হয়। এরা ইমাম জাফর সাদেকের পূর্বে ইসমাইলকে শেষ ইমাম বলে। সমস্ত হারাম বস্তুকেই এরা হালাল বা মোবাহ বলে বিশ্বাস করে। এরাই মক্কা শরীফের খানায়ে কাবার হাজরে আসওয়াদকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং ৩৫ বৎসর পর্যন্ত তাদের নিকট রাখে। সংক্রামক ব্যাধিতে এদের অসংখ্য লোক মারা যেতে থাকে। ভয়ে ভীত হয়ে এরা হাজ্রে আস্ওয়াদ ফেরত দেয়- দ্বিখন্ডিত অবস্থায়। এরা ভারতবর্ষের মুলতান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এককালে (সুলতান মাহ্মুদের পূর্বে) রাজত্ব করেছিল। এদের ফিত্নার জের হিসাবে এখনও আগাখানী ইসমাইলিয়া শিয়ারা ফিত্না সৃষ্টি করে চলছে। এরা খুবই হিংস্র।

www.sunnibarta.com

১৬। শামিতিয়া শিয়া ঃ ইসমাইলী শিয়াদের আর একটি উপশাখার নাম শামিতিয়া। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু শামীত এদের নেতা। এদের মতে ইমাম জাফর সাদেকের পর তাঁর পাঁচ পুত্র- ইসমাইল, মুহাম্মাদ, মুছা কাযেম, আবদুল্লাহ্ ও ইসহাক ক্রমানুসারে তাদের ইমাম।

১৭। মায়মুনিয়া শিয়া ঃ আহ্ওয়াজের বাসিন্দা আবদুল্লাহ্ ইবনে মায়মুন- এর অনুসারী এই দল। এরা ইসমাইলকে ইমাম মানে এবং আল্লাহ্র কুরআন ও রাসূল (দঃ) -এর হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করাকে হারাম বলে আক্বীদা পোষন করে। এরা পরকালের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

১৮। খালাফিয়া শিয়া ঃ খালাফ নামীয় জনৈক শিয়া নেতার অনুসারী এই দল। এরা মায়মুনিয়াদের মত আল্লাহ্র নিকট পুনঃ প্রত্যাবর্তনকে (বা'ছ) অস্বীকার করে এবং ইসমাইলকে ইমাম বলে স্বীকার করে। তবে কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী এরা আমল করে। শরীয়তের পরিভাষায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইবাদত করাকে ছালাত বা নামায বলে। এরা শুধু দোয়া করে।

১৯। বারকিয়া শিয়া ঃ মুহাম্মাদ ইবনে আলী বারকেয়ীর অনুসারী এই দল। ইমামতের ক্ষেত্রে খালাফিয়াদের মত আক্বীদা পোষণ করে এবং পুনরুত্থানকে তাদের মত এরাও অস্বীকার করে। কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা তাদের ইচ্ছামত করে। কোন কোন নবীকেও তারা অস্বীকার করে। এমনকি- তাঁদেরকে লা'নত পর্যন্ত করে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)।

২০। জান্নাবীয়া শিয়া ঃ ইমামী শিয়াদের ৩৫ দলের মধ্যে আবু তাহের জান্নাবীর এই উপদলটি কারামাতা শিয়াদের অনুরূপ আক্বীদায় বিশ্বাসী। এরা শরীয়তের কোন বিধি নিষেধকেই স্বীকার করে না। বরং- যারা শরীয়তের বিধি বিধান মেনে চলে, তাদেরকে কতল করা ওয়াজিব বলে। এ কারণেই তারা মক্কার হাজীদেরকে কতল করতো এবং কারামতাদের যোগ সাজছে হাজরে আসওয়াদ অপহরণ করে নিজ দেশে (ইরানে) নিয়ে গিয়েছিল।

২১। সাব্ইয়া শিয়া ঃ কারামাতা শিয়াদের একটি উপদল এরা। এরা সাত নবীকে শরীয়তের বিধান দাতা বলে বিশ্বাস করে। এদের মতে- তাঁরা হলেন- হযরত আদম, অপর পাঁচজন বিশিষ্ট নবী ও ইমাম মাহ্দী। এদের মতে এই সাতজনের মধ্যে ইসমাইল (আঃ) একজন।

২২। মাহ্দুভীয়া শিয়া ঃ আফ্রিকায় মাহ্দী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ মাহ্দী বিল্লাহ্কে এরা ইমাম মানে। এদের মতে ইমামের সংখ্যা অনেক। ইসমাইলের পর তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, তাঁর ছেলে আহম্মদ ওয়াফী, তার ছেলে মুহাম্মাদ তকী, তার

www.sunnibarta.com

ছেলে মুহাম্মাদ রাযী, তার ছেলে আবুল কাশেম আবদুল্লাহ, তার ছেলে মুহাম্মাদ মাহ্দী- (খিলাফত প্রতিষ্ঠাতা), তার ছেলে কায়েস বি-আমরিল্লাহ, তার ছেলে মানসুর বি-কুয়াতিল্লাহ্, তার ছেলে মুয়েজ লি-দীনিল্লাহ্, মানসুর আজিজ বিল্লাহ্, তার ছেলে হাকেম বি-আমরিল্লাহ্, জাহের বি-দীনিল্লাহ্, তার ছেলে মুসতানসির বিল্লাহ্ প্রমুখ ইমাম। এদের জন্ম হয় ২৯৯ হিজরীতে।

২৩। নেজারিয়া শিয়া ঃ মাহ্দুভিয়া শিয়াদের ইমাম হচ্ছে মুসতান্সির বিল্লাহ। তাঁর পরে এরা দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখার ইমাম হলেন তার ভাই নেজার। তার অনুসারীদেরকেই নেজারিয়া শিয়া বলা হয়। এদের আক্বীদা হলো- "ইমামই সর্বেসর্বা। শরীয়তের যে কোন বিধি বিধান তিনি রহিত করতে পারেন"। এই শাখার মধ্যে পরবর্তিকালে রুকন উদ্দিন ইমাম নিযুক্ত হন। তার আমলেই চেঙ্গিস খান তাবারিস্তান ধ্বংস করে। রুকুনউদ্দিন তাতারিদের হাতে নিহত হয়। তার ছেলে জাদীদউদ্দৌলা নিজেকে ইমাম বলে দাবী করে। তাতারীগণ তাকেও বিতাড়িত করে। তিনি তাবারিস্তানের কোন এক গ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এই গোত্র এখানেই ইমামশূণ্য হয়।

(এদের প্রভাবেই মোঘল সম্রাট আকবর "দ্বীনে ইলাহী" প্রবর্তন করেন এবং নিজেকে ইমামে আদিল বলে দাবী করে শরীয়তের বিধি বিধানে পরিবর্তন আনয়ন করেন। উল্লেখ্য, আকবরের মাতা হামিদা বানু ছিলেন শিয়া এবং প্রধানমন্ত্রী বৈরাম খাঁও ছিলেন শিয়া। "দ্বীনে ইলাহী" শিয়াদের প্রভাবেই প্রবর্তিত হয়। এ কারণেই হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী- (রঃ) আজীবন এই শিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং মাকতুবাত শরীফে শিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা সম্পর্কে তাঁর খলিফাদের সতর্ক করেছেন- লেখক)।

২৪। আফ্তাহিয়া শিয়া ঃ আফতাহ্ আরবী শব্দ। অর্থ- চওড়া পদযুগল। ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)- এর পঞ্চপুত্রের মধ্যে একজনের নাম আবদুল্লাহ আফতাহ্। তাঁর পদযুগল পাশে বেশী চওড়া বা প্রশস্থ হওয়ার কারণে এ নাম রাখা হয়। তাঁর অনুগামীদেরকে আফ্তাহিয়া শিয়া বলা হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্মার নামক জনৈক শিয়া এই শাখার প্রথম নেতা। এ কারণে এদেরকে আম্মারিয়া শিয়াও বলা হয়। এ শিয়াগণ ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) -এর ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ আফ্তাহ্কে ইমাম বলে বিশ্বাস করে। তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় এখানেই ইমামত পদ সমাপ্ত হয়। শিয়াদের মতে তিনি ইনতিকাল করেছেন সত্য, কিন্তু পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এরা পুনর্জন্ম (কুফরী) মতবাদে বিশ্বাসী।

www.sunnibarta.com

২৫। ইসহাকিয়া শিয়া ঃ ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) -এর পঞ্চ পুত্রের একজন ছিলেন ইসহাক। এই দলের শিয়াগণ ইসহাককে ইমাম বলে স্বীকার করে। আবদুল্লাহ আফতাহ্‌কে এরা ইমাম বলে স্বীকার করে না।

২৬। মুফাদ্দালিয়া শিয়া ঃ মুফাদ্দাল ইবনে আমর- এর অনুসারী শিয়াগণকে মুফাদ্দালিয়া শিয়া বলে। ইমাম জাফর সাদেকের পর তাঁর তৃতীয় পুত্র মুছা কাযেম (রাঃ) কে তারা ইমাম বলে মানে। এদের বিশ্বাস- হযরত মুছা কাযেম (রাঃ) নিশ্চিত ভাবেই ইন্‌তিকাল করেছেন।

২৭। মামতুরিয়া শিয়া ঃ এরাও মুছা কাযেমকে ইমাম মানে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি জীবিত আছেন এবং তিনিই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী। পরে তিনি আত্ম-প্রকাশ করবেন। তাদেরকে মামতুরিয়া বলার কারণ এই- মোফাদ্দালিয়া গ্রুপের এক নেতা ইউনুছ ইবনে আবদুর রহমান এক মুনাযারা বা বিতর্ক মজলিসে এদেরকে উপহাস করে বলেছিল- "তোমরা আমাদের নিকট ভিজা কুকুরের (কিলাব মামতুরা)" চেয়েও নিকৃষ্ট।

২৮। মুছুভিয়া শিয়া ঃ এরা হযরত মুছা কাযেম (রাঃ)- এর জীবিত থাকা বা মৃত হওয়ার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। এ কারণে তাঁর সন্তানগণকে ইমাম মানতে এরা ইতস্ততঃ করে। মুফাদ্দালিয়া ও মাম্‌তুরিয়া শিয়াদের মাঝামাঝি- সন্দেহবাদী দল এরা।

২৯। রিজইয়্যা শিয়া ঃ হযরত মুছা কাযেম (রাঃ)- এর মৃত্যুর পর তাঁর পুনরায় ফিরে আসার পক্ষপাতি দলকে রিজইয়্যা শিয়া বলে। ২৮ ও ২৯ ক্রমিকের শিয়ারা হযরত মুছা কাযেম পর্যন্ত ইমাম মানে। এরপর ইমামতের পদ মওকুফ হয়ে গেছে বলে এদের বিশ্বাস।

৩০। আহ্‌মাদিয়া শিয়া ঃ হযরত মুছা কাযেম (রাঃ)-এর ইন্‌তিকালের পর তাঁর পুত্র আহ্‌মাদকে এক দল ইমাম বলে স্বীকার করে। এরা ২৭ নং শিয়াদের কাছাকাছি। ২৮, ২৯ নম্বর শিয়াদের চাইতে এরা ভিন্নধর্মী। কেননা, ওরা পরবর্তী কোন ইমাম মানেনা, কিন্তু আহ্‌মদিয়ারা মানে।

৩১। ইস্‌না আশারিয়া শিয়া ঃ বারজন ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদেরকে ইস্‌না আশারিয়া বলা হয়। ইমামীয়া শিয়া বা ইমামপন্থী শিয়া বলতে সাধারণতঃ এদেরকেই বুঝানো হয়। এদের বারজন ইমামের নাম হলো ঃ ১। হযরত আলী (রাঃ) ২। ইমাম হাসান ৩। ইমাম হোসাইন ৪। ইমাম জয়নুল আবিদীন ৫। ইমাম বাকের ৬। ইমাম জাফর সাদেক ৭। ইমাম মুছা কাযেম ৮। ইমাম আলী রেযা ৯। ইমাম মুহাম্মাদ তাকী- ওরফে জাওয়াদ ১০। ইমাম আলী নকী ১১। ইমাম হাসান আস্‌কারী ১২। তাঁর ছেলে- ইমাম মুহাম্মাদ মাহ্‌দী। এই শেষোক্ত ইমামই তাদের ভবিষ্যতের প্রতিক্ষীত ইমাম মাহ্‌দী। ইস্‌না আশারিয়াদের একদল মনে করে- তিনি বর্তমানে আত্মগোপন করে আছেন। ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবেন। আর একদল মনে করে- তিনি

www.sunnibarta.com

ইনতিকাল করেছেন। কিন্তু পুনরায় তিনি দুনিয়ায় ফিরে আসবেন পুনর্জীবিত হয়ে- যখন পৃথিবী যুলুম ও অত্যাচারে ভরে যাবে। এই চরমপন্থী ইস্না আশারিয়া উপদলটির সূচনা হয় ২৫৫ হিজরীতে। বর্তমানে ইরানে ইস্না আশারিয়া শিয়াদের রাজত্ব চলছে। উল্লেখ্য- ইমাম মাহ্দী হবেন ইমাম হাসান (রাঃ)- এর বংশধর।

৩২। জাকারিয়া শিয়া ঃ এরাও বারজন ইমামে বিশ্বাসী। তবে তাঁদের দ্বাদশতম ইমাম হলো- জাফর। তিনি একাদশতম ইমাম হাসান আসকারীর ভাই। এদের মতে- হাসান আসকারীর কোন সন্তান 'মুহাম্মাদ মাহ্দী' নামে ছিলনা। থাকলেও বাল্যাবস্থায়ই মারা যান। অথবা আব্বাসীয় খলিফা তাকে মেরে ফেলেন। একথা তাঁর চাচা জানতে পেরে নিজেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির অংশীদার বলে দাবী করেন। ইস্না আশারিয়া জাফরকে মিথ্যাবাদী বলে। দ্বাদশ ইমামের ব্যাপারে এই দ্বন্দ্ব ইস্না আশারিয়া ও যাকারিয়াদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে।

৩৩। শাইখিয়া ঃ বর্তমানকালে ইস্না আশারিয়া দলের মধ্যে আর একটি উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এদেরকে শাইখিয়া বা আহ্মাদিয়া বলা হয়। শাইখ আহম্মাদ ইহ্সায়ী এই দলের নেতা। হযরত আলী (রাঃ) কে এরা দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী আক্লে আউয়াল বলে- যা সরাসরি শিরক্।

৩৪। রোশ্তিয়া ঃ সৈয়দ কাযেম হোসাইনী রোশ্তি এই নতুন দলের নেতা। তিনি শাইখ আহম্মাদ ইহ্সায়ীর ছাত্র। তাঁর আক্বীদা তার ওস্তাদের আক্বীদার চাইতেও জঘন্য।

৩৫। কুর্রিয়া ঃ কুর্রাতুল আইন নাম্নী এক মহিলা এই দলের নেত্রী। তার নাম হিন্দা, ডাকনাম উম্মে সালমা এবং উপাধী কুর্রাতুল আইন। সৈয়দ কাযেম রোশ্তির পর সে নিজেকে মহিলা ইমাম বলে দাবি করে। এই মহিলার মতে- "মহিলাদের যৌন স্বাধীনতা বৈধ এবং শরিয়তের বিধি বিধানকে সে রহিত বলে ঘোষণা করে"। (বাংলাদেশের কুখ্যাত নারী তসলিমা নাসরীনও নারীর যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী)। এই ভন্ড দলের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যুগ খতম হয়ে গিয়েছে। নামায হলো বিশেষ যুগের সাথে সম্পৃক্ত (নাউযুবিল্লাহ্)। এদের মতে ওহীর দরজা বন্ধ হয়নি। এখনও কামিল ব্যক্তিদের নিকট না কি ওহী আসে। তবে- তা শরীয়তমূলক নয়- বরং শিক্ষামূলক (তাশ্রীয়ী নয়- তালিমী)। এই মহিলা শাহ্ নাসির উদ্দিনের রাজত্ব কালে বিদ্রোহ করে এবং সদলবলে নিহত হয়। তার কিছু ভক্ত তেহ্রান ও ইরাকে পরিদৃষ্ট হয়।

সারসংক্ষেপ ঃ

শিয়াদের ফির্কা বা দল উপদল হিসেব করলে ৪+২৪+৩৫= মোট ৬৩টি দাঁড়ায়। ৭২ ফির্কার একটি ফির্কা হলো শিয়া। এদের মধ্যেই পূনঃ ৬৩টি উপ-ফির্কা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের এই বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করুন।

www.sunnibarta.com

চতুর্থ পর্ব

শিয়াদের ১২টি ভ্রান্ত আক্বীদা ঃ

শাহ্ আবদুল আজিজ দেহ্লভী রহমতুল্লাহি আলাইহি তোহ্ফায়ে ইস্না আশারিয়া গ্রন্থে শিয়া ফির্কা সমূহের কতিপয় গোম্রাহ আক্বীদা উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

১। **শিয়াদের মতে ঃ** যুগে যুগে নবী প্রেরণ করা আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক। **আহ্লে সুন্নাতের মতে** ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ- বাধ্যতামূলক নয়। কেননা, এমন যুগও ছিল- যখন কোন নবী ছিলেন না। যেমন, হযরত ইছা ও আমাদের নবীর মধ্যবর্তী ৫৭০ বৎসরের যুগ। কোন কাজ আল্লাহ্র উপর ওয়াজিব হলে তা করতে আর একজন আল্লাহ্র প্রয়োজন হয় (নাউযুবিল্লাহ্)। সুতরাং কোন কাজ খোদার উপর ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত- ইত্যাদি হতে পারেনা। এসব হুকুম বান্দার বেলায় প্রযোজ্য।

২। **ইমামপন্থী শিয়াগণ বলে ঃ** হযরত আদম (আঃ) সহ সাতজন উচ্চস্তরের পয়গাম্বর ব্যতিত অন্যান্য নবীগণের চেয়ে হযরত আলী (রাঃ) উত্তম (নাউযুবিল্লাহ্)।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- নবীগণ ফেরেস্তাদের চেয়েও উত্তম। হযরত আলী নায়েবে নবী ও উম্মত মাত্র। উম্মত কোন দিনই নবীর চেয়ে উত্তম হতে পারে না।

৩। **ইমামিয়া শিয়াদের মতে ঃ** নবীগণের পক্ষে কোন কোন সময় মিথ্যা কথা বলা বা কারও উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া জায়েয- বরং ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তাদের পরিভাষায় ইহাকে "তুক্ইয়া" বলে।

আহ্লে সুন্নাতের মতে- নবীগণ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মনগড়া কথা, মিথ্যা কথা ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া- ইত্যাদি দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত কোন পাপই তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। কেননা, নবীগণের সমস্ত কাজই অনুসরণ করা উম্মতের উপর ফরয। যদি তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন বা গুনাহ করতেন- তাহলে এটাও উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেতো।

৪। **ইমামিয়া শিয়াদের মতে ঃ** নবীগণ নবুয়্যতের দায়িত্ব লাভের সময়- এমনকি আল্লাহর সাথে কালাম করার সময়ও ঈমান এবং আকায়িদের মৌল নীতিমালা সম্পর্কে অবগত থাকেন না। সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার পরেই তাঁরা ঈমান ও আকায়িদের মৌলিক ধারণা লাভ করে থাকেন (নাউযুবিল্লাহ্)।

www.sunnibarta.com

সুন্নী মুসলমানদের ঐক্যমতে- নবীগণ জন্ম সূত্রেই ঈমানের জরুরী বিষয় সমূহ অবগত হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। কেননা, আকায়িদ ও ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞতার অর্থ হলো- কুফর। আর কুফরী অবস্থায় নবুয়তের দায়িত্ব অর্পন করা অবৈধ। শরীয়তের খুঁটি-নাটি বিস্তারিত বিষয় নবুয়ত লাভের পরেই ওহীর মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। মোদ্দা কথা-ঈমানী বিষয়ে সকল নবীগণই জন্মসূত্রে অবগত এবং বিধি বিধানের বিস্তারিত তফসীল তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অবগত হন।

কুরআনের আয়াত "মা-কুন্‌তা তাদ্‌রী মাল কিতাবু ওয়ালাল ঈমান"- (অর্থ- হে নবী, আপনি কিতাব ও শরীয়তের তাফসীলী বর্ণনা সম্পর্কে পূর্বে অবগত ছিলেন না)- এর সারমর্ম ইহাই। শিয়াদের অনুরূপ আক্বীদা পোষণ করেন জামাতে ইসলামীর কোন এক নেতা। তিনি "ইসলামে নবীর মর্যাদা" প্রবন্ধে সিরাতুন্নবী সংকলন পুস্তকে লিখেছেনঃ "নবীগণ নবুয়ত লাভের পূর্বে জানতেন না যে, তিনি একজন ভবিষ্যৎ নবী" (নাউযুবিল্লাহ্)। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) বলেন ঃ আমি মায়ের গর্ভে থাকতেই লওহে মাহ্‌ফুযে কলমের লেখনীর আওয়াজ শুনতাম। আমি শিশুকালে চাঁদের সাথে কথা বলতাম- ইত্যাদি। দেওবন্দী আলিমগণও শিয়াদের অনুরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন- লেখক।

৫। ইমামিয়া শিয়াদের মতে ঃ কোন কোন নবী থেকে গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, হযরত আদম, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইউনুছ ও হযরত মুছা আলাইহিমুস সালাম প্রমূখ গুনাহ করেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। একই আক্বীদা পোষণ করেন মাওলানা মওদুদী ও তার অনুসারী জামাতে ইসলামী। ("তাফ্‌হীমুল কোরআন" দেখুন)।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত- এর আক্বীদা হচ্ছে- নবীগণ নবুয়তের পূর্বে ও পরে- ছোট বড় সব ধরনের গুনাহ্ হতে নিস্পাপ-মাসুম। হযরত আদম, হযরত ইবরাহীম, হযরত ইউনুছ ও হযরত মুছা আলাইহিমুস সালামের যেসব কার্য্যাবলীকে শিয়া, মুতাজেলা ও মউদুদীবাদীরা গুনাহ্ বলে মনে করে- ঐগুলো খেলাফে আওলা বা অনুত্তম পর্য্যায়ভূক্ত- কিন্তু বৈধ। শিয়াদের প্রভাবের কারণে যারা বলে- "কোন নবীই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন না" (নাউযুবিল্লাহ্)- তারা এক্ষেত্রে শিয়া ও মউদুদীর অনুসারী। (দেখুন- প্রেমাঞ্জলী)।

৬। শিয়াদের নেতা ইবনে বাবুওয়াই স্বীয় 'উয়ুনু আখ্‌বারে রেযা' গ্রন্থে ইমাম রেযা (রাঃ)- এর বরাতে লিখেন ঃ যখন আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেস্তাদের দিয়ে আদমকে সিজ্‌দা করালেন এবং বেহেস্তে স্থান দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন- তখন হযরত আদম (আঃ) মনে মনে ভাবলেন- আমিই আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর এ অবস্থা বুঝে আল্লাহ্ তায়ালা আরশের দিকে তাকাবার জন্য আদমকে নির্দেশ দিলেন। হযরত আদম (আঃ) মাথা তুলে আরশের পায়ায় লেখা দেখলেন- "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই; মোহাম্মাদ (দঃ) তাঁর রাসুল; হযরত আলী আল্লাহ্‌র ওলী ও মুসলমানদের নেতা, বিবি ফাতিমা বিশ্ব নারীদের নেত্রী; ইমাম হাসান এবং হোসাইন

www.sunnibarta.com

বেহেস্তী যুবকদের সর্দার"। তখন আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন- এরা কে? আল্লাহ্ বললেন- তোমারই সন্তান এবং তোমার চেয়ে উত্তম। আমার সমগ্র সৃষ্টি হতে এরা উত্তম। এরা না হলে আমি তোমাকে- এমনকি- বেহেস্ত-দোযখ আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। হে আদম, তুমি এদেরকে হিংসার নজরে দেখোনা। তাহলে তোমাকে বেহেস্ত থেকে বের করে দেবো। কিন্তু আদম তাঁদের দিকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখলেন। তাই আল্লাহ্ তায়ালা আদমের পিছনে শয়তান লাগিয়ে দিয়ে তাঁকে বেহেস্ত হতে বিতাড়িত করলেন" (নাউযুবিল্লাহ্)। উক্ত গ্রন্থে ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ জাফর সাদেক (রাঃ)- এর বরাত দিয়ে আরও উল্লেখ আছে ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে সব বৃক্ষের ফল ভক্ষনের অনুমতি দিয়ে একটি ফলবৃক্ষ নিষিদ্ধ করে দিলেন। আদম ও হাওয়া বেহেস্তে পাক পাঞ্জাতন ও তৎপরবর্তী ইমামদের মর্তবা দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলেন। তাই তাঁরা লাঞ্ছিত হলেন" (নাউযুবিল্লাহ্)।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং সমগ্র মুসলমানদের ঐক্যমত হলো -হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার শানে এসব দোষারুপ করা তাঁদের অবমাননার শামিল এবং কুরআন হাদীসের পরিপন্থী। নবীগণের অবমাননা করা কুফরী। তাছাড়া পিতা-মাতা নিজ সন্তানের সম্মান ও মর্যাদা দর্শনে হিংসায় জ্বলে উঠতে পারেন না। শিয়াদের কথা মেনে নিলে আদম (আঃ) ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? শয়তান আদমের প্রতি হিংসা করে অপদস্ত হলো; আর আদম (আঃ) নিজ সন্তানের প্রতি হিংসা করে একই অপরাধে অপরাধী হলেন? (নাউযুবিল্লাহ্)। আরশের পায়ায় নাম লেখা ছিল শুধু রাসুলুল্লাহর (দঃ)। শিয়ারা জুড়ে দিলো- আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসেনের নাম। এটা হলো হাদীসের বিকৃতি বা তাহ্রীফ। মনগড়া ব্যাখ্যায় মউদুদী সাহেবও শিয়াদের মতই পটু। নবীগণের শানে অমর্যাদাকর উক্তি থেকে একমাত্র সুন্নাতপন্থী মুসলমানগণই সদা সতর্ক থাকেন- লেখক।

৭। ইমামিয়াপন্থী শিয়াদের মতে ঃ কোন কোন নবী খোদাপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ওজর আপত্তি ও অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ তারা বলে- খোদা যখন হযরত মুছা (আঃ) কে বললেন- হে মুছা! তুমি যালিম বাদশাহ ফিরাউনের নিকট গমন করো। তখন মুছা (আঃ) বলেছিলেন- "হে খোদা, আমি মনে করি- ফিরাউন ও তার প্রজারা আমাকে সত্য বলে স্বীকার করবে না। তদুপরি আমার তর্ক করার ক্ষমতা কম এবং আমার কথা অস্পষ্ট। সর্বোপরি- আমি এক কিব্তী যুবককে চপেটাঘাত করে মেরে ফেলেছি। তাই ভয় পাচ্ছি- তারা আমাকে মেরে ফেলবে। সুতরাং হে খোদা, তুমি আমার ভাই হারুনকে আমার পরিবর্তে নবুয়ত দিয়ে পাঠাও। তিনি আমার চাইতে বেশী বাগ্মী"।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো ঃ আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোন নবীই ওজর আপত্তি করতে পারেন না। কেননা, ওজর আপত্তিকারী ব্যক্তি বিশ্বস্ত হতে পারেন না। শিয়াগণ কুরআনে উল্লেখিত মুছা নবীর ঘটনা সমূহ অপব্যাখ্যা সহকারে

www.sunnibarta.com

বিকৃত করেছে এবং এই অপব্যাখ্যা থেকে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য যে, মউদুদী সাহেবও হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের বেলায় রাত্রিতে চাঁদ-তারা দর্শন করার আয়াতকে তাঁর স্বীকৃতিমূলক কালাম বলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে ক্ষণিকের জন্য মুশরিক সাব্যস্ত করেছেন (তাফহীমুল কুরআন)। যারা কোন নবীকে এক মুহূর্তের জন্য মুশরিক বলে ধারণা করবে- তারা নির্ঘাত কাফির। শিরিক, কুফর, কবিরাহ- ইত্যাদি গুনাহ্ নবীদের শানে আরোপ করা কুফরী ও বেদ্বীনী। হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর উক্তি ছিল প্রশ্নবোধক ও তিরস্কারমূলক- স্বীকৃতিমূলক ছিলনা। -লেখক।

৮। গোরাবিয়া শিয়ারা বলে ঃ হযরত আলী (রাঃ)- এর শারিরিক গঠন নবী করিম (দঃ)- এর মত ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা জিব্রাইলকে রিছালাতের ওহী দিয়ে হযরত আলীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জিব্রাইল (আঃ) ভুল করে মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট রিছালাত বাণী পৌঁছিয়ে দেন (নাউযুবিল্লাহ্)।

ইসলামী আক্বীদা হচ্ছে- হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (দঃ)- ই শেষ নবী- হযরত আলী নবী নন। জিব্রাইল আমীন আমানতদারীর সাথেই সঠিক পাত্রে ওহী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভুল হয়নি। কেননা, জিব্রাইলের ভুল হয়ে থাকলে খোদা কেন জেনে শুনেও তা সংশোধন করেননি? মূলতঃ এই শিয়াগণ চরমপন্থী। আর চরমপন্থী শিয়ারা কাফির। কাদিয়ানী ফির্কাকেও এরা হার মানিয়েছে।

৯। ইসমাইলী, মোয়াম্মারী ও মনসুরিয়া শিয়া গোত্রত্রয় মূল মেরাজকেই অস্বীকার করে। মনসুরীয়া শিয়াগণ বলে- মেরাজ শুধু একা নবী করিম (দঃ)- এর হয়নি। তাদের নেতা আবুল মনসুর আজালিও মিরাজ গমন করেছিল বলে তারা বিশ্বাস করে। আবুল মনসুর নাকি সামনা সামনি খোদার সাথে কথা বলেছে এবং খোদাও আবুল মনসুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। ইমামিয়া শিয়াদের একদল বলে- হযরত আলীও ঐ মিরাজে রাসুল করিম (দঃ)- এর সাথে শরীক ছিলেন। আর একদল বলে- হযরত আলী আরশে গমন করেননি- তবে তিনি পৃথিবীতে থেকেই ঐসব কিছু অবলোকন করেছিলেন- যা অবলোকন করেছিলেন নবী করিম (দঃ) ওখানে গিয়ে (নাউযুবিল্লাহ্)।

ইসলামী আক্বীদা হচ্ছে ঃ আকাশে ও উর্দ্ধ জগতে নবী করিম (দঃ)- এর মিরাজে অন্য কেউ তাঁর সাথে শরীক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একা। জিব্রাইল (আঃ) ছিলেন সাথী। কোরআন মজিদে 'বি-আব্‌দিহী' শব্দ দ্বারা একক নবীকেই মিরাজে গমনের মালিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে থেকেই যদি উর্দ্ধ জগতের সব কিছু অবলোকন করা যেতো- তবে এত আয়োজন করে নবী করিম (দঃ) কে নেয়া হয়েছিল কেন? এতে তো হযরত আলীরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়- এটা কুফরী। শিয়াদের এই মিথ্যা অপবাদ মনগড়া ও ইসলাম বিরোধী আক্বীদা।

www.sunnibarta.com

১০। শিয়াদের অনেক উপদলই শরীয়তের বিধি বিধান রহিত হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করে। যেমন সাবইয়া, খাত্তাবিয়া, মানসুরিয়া, মুয়াম্মারীয়া, বাতিনীয়া, কারামাতা, রেজামিয়া- প্রভৃতি শিয়াগণ এই আক্বীদা পোষণ করে যে, বর্তমানে শরীয়তের সব বিধি বিধান রহিত হয়ে গেছে। এরা আরও বলে- নামায রোযা হজ্ব যাকাত দ্বারা প্রচলিত ইবাদাত বুঝায় না। এগুলোর একটি গোপন অর্থ আছে-যার অর্থ একমাত্র ইমাম মাসুম জানেন- অন্য কেউ নয়।

কুরআন ও হাদীসের বাণী সমূহ প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করা মুসলমানদের আক্বীদা। কুরআন হাদীসের বিধি বিধান স্পষ্ট ও চিরস্থায়ী।

১১। ইমামিয়া শিয়ারা বলে ঃ হযরত আলী (রাঃ)- এর নিকটও ফেরেস্তা ওহী নিয়ে আসতো। নবী ও হযরত আলীর ওহীর মধ্যে শুধু পার্থক্য এতটুকু যে- নবী করিম (দঃ) ফেরেস্তা দেখতেন, কিন্তু আলী শুধু কথা শুনতেন- ফেরেস্তা দেখতেন না। আর একদল শিয়া বলে- নবী করিম (দঃ)- এর ইন্তিকালের পর বিবি ফাতিমা (রাঃ)- এর নিকট ওহী আসতো। এ ওহী জমা করে রাখা হয়েছে এবং এর নাম মাস্হাফে ফাতিমা। ভবিষ্যতে সংঘটিত অনেক ঘটনা ও ফিৎনা ঐ ফাতিমী মাস্হাফে লিখা আছে। তাদের ইমামগণ ঐ মাসহাফ দেখে দেখে গায়েবী সংবাদ প্রকাশ করে থাকেন।

ইসলামী আক্বীদা হচ্ছে ঃ নবী করিম (দঃ) -এর পর আল্লাহর বাণী নিয়ে আর কোন ফেরেস্তা দুনিয়াতে আসেননি। তাদের এই ধারনা পবিত্রাত্মাদের প্রতি অপবাদ মাত্র।

১২। শিয়ারা বলে ঃ ইমামের এই ক্ষমতা আছে যে, তিনি যখন মনে করেন, তখন যে কোন শরীয়তী বিধান পরিবর্তন বা বাতিল করে দিতে পারেন (নাউযুবিল্লাহ্)।

মুসলমানদের কোন ধর্মীয় ইমাম বা নেতার এই অধিকার নেই যে, সে শরীয়তের কোন বিধান মানসুখ বা বাতিল করে দিতে পারেন বা পরিবর্তন করতে পারেন। ইহা একমাত্র নবীর শান। তিনি ছাহেবে শরিয়ত। তিনি পারেন রহিত করতে বা পরিবর্তন করতে।

www.sunnibarta.com

ইসলামের তিন খলিফা ও হযরত আয়েশার (রাঃ) বিরুদ্ধে শিয়াদের অবমাননাকর উক্তি ঃ

১। হযরত আবু বকর (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে শিয়াদের অপবাদ ঃ

তোহ্‌ফায়ে ইস্‌না আশারিয়া- কৃত শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ) নামক গ্রন্থে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে শিয়াদের কতিপয় অবমাননাকর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে- যার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) "হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন মসজিদে নববীর মিম্বারে দাড়িয়ে খুত্‌বা দিতে উঠলে হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) দুই ভাই এসে তাঁকে রাসুলুল্লাহর মিম্বার থেকে নেমে যেতে বলেছিলেন। কাজেই হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হওয়ার যোগ্য নন"।

তাদের এই মনগড়া উক্তির জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ যে, সে সময় ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) ৮-৯ বৎসরের বালক ছিলেন। তাদের কথা হাস্যকর।

(খ) "নবী করিম (দঃ) হযরত আবু বকরকে (রাঃ) কোন দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেতৃত্ব প্রদান করেন নি"।

তাদের এই উক্তি মিথ্যা। কারণ, নবী করিম (দঃ) ওহুদ যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ানের পশ্চাদধাবন করার জন্য হযরত আবু বকরকে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। এছাড়াও ৯ম হিজরীতে মুসলমানদের প্রথম হজ্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমিরুল হজ্ব নিযুক্ত করেছিলেন। হুযুরের ওফাতের ৫ দিন পূর্বে তাঁকে মসজিদে নববীতে হুযুরের স্থলে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন- যার পিছনে সমস্ত সাহাবা ১৯ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন।

(গ) "হযরত আবু বকর (রাঃ)- হযরত ওমর (রাঃ) কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যান- অথচ নবী করিম (দঃ) হযরত ওমরকে একবার যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করে নেন"।

এর অর্থ কি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা? অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণেই হয়তো তিনি তা করেছিলেন।

www.sunnibarta.com

(ঘ) "নবী করিম (দঃ) নিজে কোন 'উত্তরাধিকারী বা খলিফা নিযুক্ত করে যাননি'- অথচ, হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজে ওমর (রাঃ) কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যান। এটা সরাসরি নবীজির আদর্শের খেলাফ"।

শিয়াদের এই অভিযোগও মিথ্যা। নবী করিম (দঃ) ইশারা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। হুযুরের ইশারাই খলিফা নিযুক্তির জন্য স্পষ্ট ঘোষণার সমতুল্য। তদুপরি- মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে যে, ওহীর মাধ্যমে পূর্বেই নবী করিম (দঃ) কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ হযরত আবু বকরকেই খলিফা নিযুক্ত করবে। সুতরাং ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তদুপরি- শিয়াদের কথার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের ইমাম হযরত আলীকেও হুযুর (দঃ) খলিফা নিযুক্ত করে যাননি। 'কোন খলিফা নিযুক্ত করে যাননি'- এই কথাই তার প্রমান।

(ঙ) "হযরত আবু বকর (রাঃ)- বিবি ফাতিমা (রাঃ) কে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন একমাত্র নিজের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে। হাদীসটি হলোঃ "আমরা নবী সম্প্রদায় যে সম্পত্তি রেখে যাই- তা সদকা বা জনগণের জন্য দান হিসেবে গন্য হবে। পরিবারের কেউ তা পাবে না"। অথচ কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি তোমাদের আওলাদের জন্য নিজে বন্টন করে দিয়েছেন। পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ পাবে।" হযরত আবু বকর কুরআনের উক্ত নির্দেশকে অমান্য করে নিজের শ্রুত হাদীসের দ্বারা বিবি ফাতিমাকে রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)- এর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।"

শিয়াদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা, উক্ত হাদীসখানা হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামন, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবু দারদা, আবু হুরায়রা, আব্বাস, হযরত আলী, হযরত ওসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস- প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে- শুধু একা হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে নয়। দ্বিতীয়তঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নিজ কন্যা বিবি আয়েশাকেও নবীজীর সম্পত্তি দেননি। হযরত আব্বাসকেও দেননি। ফারায়েয মতে তাঁরাও সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন। আল্লাহ্র এই বাণী সাধারণ মুমিনদের বেলায় প্রযোজ্য- নবীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ জন্যই কোরআনে "তোমাদের বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) নবীজীর হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। যখন জানতে পারলেন, তখন তিনিও দাবী প্রত্যাহার করে নিলেন। সুতরাং শিয়াদের এই অভিযোগ হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত- সত্যের উপর নয়। তদুপরি হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)- এর জন্য এর পরিবর্তে বাইতুলমাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

(চ) "নবী করিম (দঃ) ফিদাকের এক খন্ড জমি বিবি ফাতিমা (রাঃ) কে হেবা সূত্রে দান করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তা থেকেও বিবি ফাতিমাকে বঞ্চিত করেছেন"।

www.sunnibarta.com

শিয়াদের এই অভিযোগ সত্য নয়। কেননা, নবী করিম (দঃ) হেবা করে থাকলে নিশ্চয়ই দখল বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি দখল বুঝিয়ে দেন নি এবং বিবি ফাতিমাও দখল নেননি। সাময়িকভাবে উৎপন্ন ফসল ভোগ করার জন্য দেয়া হয়েছিল মাত্র। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) যখন বায়তুল মাল থেকে বিবি ফাতিমার পরিবারের জন্য ভাতা নির্ধারিত করলেন, তখনই উক্ত জমি সরকারী কোষাগারে নিয়ে নেয়া হয়। বিকল্প ব্যবস্থা না করে উক্ত জমি ছিনিয়ে নিলে দোষ দেয়া যেতো। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছেঃ বিবি ফাতিমার ঘরে তিনি নিজে গিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে বিবি ফাতিমা (রাঃ) তাতে রাজী হয়ে যান। নিষ্পত্তিকৃত বিষয়টি নিয়ে শিয়ারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করেছে।

(ছ) "হযরত আবু বকর (রাঃ) শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি এক চোরের বাম হাত কেটে দিয়েছিলেন"।

শিয়াদের এই অভিযোগ মিথ্যা। রাসুলুল্লাহ (দঃ)- এর সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাহচর্য্য পেয়েছিলেন হযরত আবু বকর ও হযরত আলী। পূর্ণ ২৩ বৎসর তাঁরা উভয়েই ছায়ার মত নবী করিম (দঃ)- এর সাথে সাথে থাকতেন। এজন্যই বাতিনী ইলমের ৪টি তরিকার মধ্যে কাদিরিয়া ও চিশ্‌তিয়া দুটি তরিকার উৎসমূল হলেন হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন নক্‌শবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরিকার উৎসমূল। **হযরত আবু বকর (রাঃ) তৃতীয়বার চুরির অপরাধে বাম হাত কেটে ছিলেন। এটাই শরীয়তের বিধান।** সুতরাং কম ইল্‌মের অপবাদ আদৌ সত্য নয়।

(জ) শিয়াদের মতে- "হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) তিনজনই ছিলেন মুনাফিক-প্রকৃত মুসলমান নন। (নাউযুবিল্লাহ্)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত- এর মতে এই জঘন্য অপবাদদাতা শিয়ারা ইসলাম ও নবীর দুশমন। শিয়াদের মতেই- ইমাম হযরত আলী (রাঃ) নিজে তিনজন খলিফার যুগে তাদের উজির সভার সদস্য ছিলেন এবং তাঁদের পিছনে নামাযও পড়েছিলেন। তাছাড়া যদি তাঁরা ঐ রকমই হতেন- তাহলে হযরত আলী (রাঃ) নিশ্চয়ই তাঁদের উযির হতেন না এবং তাঁদের পিছনে নামাযও পড়তেন না। শিয়াদের এই বিশেষ সাহাবী দুশমনি বর্তমানেও কোন কোন মুসলমানের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা শিয়া প্রভাবেরই ফল। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে মুনাফিক বলা হারাম। (ইরফানে শরিয়ত)।

(ঝ) শিয়াদের মতে ঃ "যেকোন ভাল কাজ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কে অভিসম্পাত করা অধিক উত্তম"।

আল্লাহ্ যেসব সাহাবীদের শানে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" বলেছেন- সেই সাহাবীগণের শীর্ষস্থানীয় দুজনকে শিয়াদের লানত করা বা অভিসম্পাত করা দ্বীন ও ঈমানের পরিপন্থী কাজ।

www.sunnibarta.com

একটি কারামতি ঘটনা ঃ

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে ঃ ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)- এর যুগে তাঁরই প্রতিবেশী জনৈক রাফিজীর (চরমপন্থী শিয়া) দুটি গাধা ছিল। সে একটির নাম রাখে আবু বকর- দ্বিতীয়টির নাম রাখে ওমর। এভাবে সে মনের ঝাল মেটাচ্ছিল। একদিন শুনা গেল- একটি গাধার লাথিতে উক্ত রাফিজী নিহত হয়েছে। একথা শুনে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) জনৈক শাগরিদকে ঘটনার খোঁজ নিতে বললেন এবং মন্তব্য করলেন যে, সম্ভবতঃ ওমর নামীয় গাধাটিই রাফিজীকে খুন করে থাকবে। শাগরিদ ঘটনা যাচাই করে এসে বললেন- হুযুর! আপনার কথাই ঠিক। (সোব্‌হানাল্লাহ)।

শিয়ারা হযরত আলী ও পাক পাঞ্জাতনের পক্ষপাতিত্ব করতে গিয়ে অন্য সাহাবীদেরকে কাফির, মুনাফিক, মুরতাদ- ইত্যাদি অশালীন বাক্যে জর্জরিত করেছে। নবী করিম (দঃ) এর সতর্ক বাণী হচ্ছে "আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহর গযবের ভয় করো। তাঁদেরকে তোমরা সমালোচনার শিকারে পরিণত করো না। তাঁদের প্রতি ভালবাসা আমার প্রতি ভালবাসারই প্রতীক এবং তাঁদের প্রতি দুশমনি আমার প্রতি দুশমনিরই প্রতীক।" (বুখারী)।

২। হযরত ওমর (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে অপবাদ ঃ

(ক) শিয়ারা হযরত ওমর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অপবাদ আরোপ করে বলেছে যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (দঃ) অসুস্থ অবস্থায় ইনতিকালের ৫ দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন যোহর নামাযের পর হতে আর মসজিদে যেতে পারেননি। অসুখে তিনি ক্ষনে ক্ষনে অস্থির হয়ে উঠতেন। এমন অবস্থায় হুজরা মুবারকে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে তিনি এরশাদ করলেন- "তোমরা কাগজ নিয়ে এসো- আমি এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবো- যাতে তোমরা আর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।"

সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। কেহ বললেন- কাগজ কলম নিয়ে আসুন। আবার কেহ বললেন- এমতাবস্থায় হুযুর (দঃ) কে কাগজ কলম দেয়া ঠিক হবে না। কুরআন মজিদ তো পূর্ণ নাযেল হয়ে গেছে এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে বলে কুরআনেই ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং হুযুর (দঃ) কে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? তিনি অসুখের তাড়নায় এমনিতেই অস্থির। হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন এই মতের মধ্যমণি। আল্লাহর নবীর সামনে এভাবে বিতর্ক করা অশোভনীয় ছিল। সাহাবায়ে কেরামের বিতর্ক দেখে নবী করিম (দঃ) বলে উঠলেন- "আমাকে একা থাকতে দাও, আমি এখন যে অবস্থায় আছি, তোমদের বিতর্কের চাইতে এটা অনেক উত্তম।"

একথা বলেই তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ করলেন। যথা ঃ (১) আরব উপদ্বীপ থেকে তোমরা মুশরিকদেরকে বহিস্কার করে দেবে (২) আমি যেভাবে কোন প্রতিনিধি

www.sunnibarta.com

দলকে খাতির সম্মান করেছি, তোমরাও অনুরূপ করবে (৩) ইবনে আব্বাস বলেনঃ তৃতীয়বারে হয় তিনি চুপ ছিলেন অথবা কিছু বলেছিলেন- কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি"। (বুখারীঃ কিতাবুল ইলম অধ্যায়, কিতাবুল মুয়াদায়াহ, কিতাবুল মাগাজী, কিতাবুল মারাদ ওয়াত তিব্ব, কিতাবুল ইতিছাম)।

শিয়াগণ এই সূত্র ধরে হযরত ওমর (রাঃ)- এর উপর আক্রমন পরিচালনা করে বলেছে- নবী করিম (দঃ)- এর প্রতিটি বাণীই ছিল ওহী দ্বারা পরিচালিত। হযরত ওমর (রাঃ) নবী করিম (দঃ) এর নির্দেশ অমান্য করে প্রকারান্তরে ওহীতে বাধা সৃষ্টি করেছেন। ওহীতে বাধা সৃষ্টি করা কুফরী"।

শিয়াদের এই আক্রমনের জবাব দিতে গিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন (১) হযরত ওমর (রাঃ) যদি হুযুর (দঃ)- এর নির্দেশ অমান্য করে দোষী সাব্যস্থ হন, তাহলে হযরত আলীও (রাঃ) তো হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখতে গিয়ে নবী করিম (দঃ) -এর একটি নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। সেটি হলো 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য হুযুর (দঃ) হযরত আলীকে নির্দেশ করলে আলী (রাঃ) তা করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কেউ তো- এমনকি শিয়ারাও ঐ কাজকে দোষনীয় বা 'ওহীতে বাধা দান' বলে মন্তব্য করেনি! হযরত ওমরের বেলায় শিয়ারা দোষারোপ করছে কেন?

আসলে ব্যাপারটি ছিল নবীর প্রেম ও ভালবাসা। হযরত আলী যেমন নবীজীর মহব্বতে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন- হযরত ওমরও (রাঃ) তদ্রূপ হুযুরের কষ্ট হবে বলে কলম আনতে ইতস্ততঃ করেছিলেন। যদি তা খোদার অলংঘনীয় ওহী-ই হতো এবং লিখা বাধ্যতামূলক হতো- তাহলে নবী করিম (দঃ) পরবর্তী সময়ে অবশ্যই তা লিখে দিতেন- নতুবা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা বলে তা সাব্যস্ত হতো। মোট কথা- হযরত আলীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি যেমন পরামর্শমূলক ছিল এবং বাধ্যতামূলক ছিলনা- তদ্রূপ হযরত ওমরের (রাঃ) বেলায়ও পরামর্শমূলক ছিল। শিয়াগণ হযরত ওমরের বেলায় আক্রমনমূলক কথা বললেও হযরত আলীর বেলায় একেবারেই চুপ। এটা ইনসাফের খেলাপ।

(খ) শিয়াগণ দ্বিতীয় অভিযোগে বলে ঃ "হযরত ওমর (রাঃ) শরীয়তের কোন কোন বিধি বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। খিলাফতের জন্য শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরী। হযরত ওমরের তা ছিল না। সুতরাং তিনি খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না"। উদাহরণ স্বরূপ শিয়াগণ বলে- হযরত ওমর (রাঃ) জ্বেনার দ্বারা গর্ভবতী এক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এই রায় সংশোধন করে বলেছিলেন- অপরাধ হলো মহিলার। তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলে তার পেটের সন্তানকেও হত্যা করা হবে। এটাতো শরীয়তে বৈধ নয়। তখন হযরত ওমর (রাঃ) আনন্দে বলে উঠলেন "আলী না থাকলে ওমর আজ ধ্বংস হয়ে যেতো"।

www.sunnibarta.com

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব আহ্‌লে সুন্নাতের মুহাদ্দিসীনগণ এভাবে দিয়েছেন- হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট শুধু জ্বিনার প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছিল- গর্ভধারনের বা পেটের সন্তানের কোন প্রমাণ তাঁর কাছে ছিল না। যখন হযরত আলী (রাঃ) গর্ভের সন্তানের সংবাদ দিলেন- তখন হযরত ওমর (রাঃ) গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড স্থগিত রাখেন। কারও কাছে কোন বিষয়ের প্রমাণ না থাকার অর্থ শরীয়তের জ্ঞানের অভাব নয়। এটা হয়েছিল সাক্ষীর অভাবে। এটা হলো শিয়াদের অপকৌশল মাত্র।

(গ) শিয়াগণ বলে ঃ হযরত ওমর (রাঃ) দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু বিদআত চালু করেছেন- যা দ্বীনের অংশ নয়। যেমন- তিনি জামাতের সাথে তারাবিহ্ নামায কায়েম করাকে উত্তম বিদআত বলে অভিহিত করেছেন। অথচ নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন "সব বিদআতই গোমরাহী"। তিনি আরও বলেছেন, "কোন ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে যদি এমন জিনিস নুতনভাবে সংযোজন করে- যা ধর্মের অংশ নয়, তা বাতিল বলে গন্য হবে"। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) ধর্মে তারাবিহর নূতন বিদআত চালু করার দোষে দোষী। (নাউযুবিল্লাহ্)।

শিয়াদের এ অভিযোগ সত্য নয়। কেননা, হাদীসে মুতাওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিন রাত্র পর্যন্ত জামায়াতের সাথে তারাবিহ্ নামায পড়েছিলেন। চতুর্থ রাত্রি থেকে তা বন্ধ করে দেন এবং এরশাদ করেন- "আমি ভয় করছি- এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে।" হুযুর পুরনুর (দঃ)- এর ইনতিকালের পর ওহী বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ফরয হওয়ার ভয়ের কারণ তিরোহিত হয়ে যাওয়াতে হযরত ওমর (রাঃ) নবীজীর সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেছেন মাত্র। ইহা নুতন সংযোজন নয়। হযরত ওমর (রাঃ) জামাতের সাথে তারাবিহ আদায় করাকে উত্তম বিদআত বলার কারণ হলো- নবীজীর পরে নূতন করে তা পুনরায় চালু হয়েছে মাত্র। শাব্দিক অর্থে বিদআত হলেও পরিভাষায় তা সুন্নাত। কোন কাজ বন্ধ করার পেছনে বিশেষ কারণ থাকলে পরে সেই কারণের ভয় না থাকলে বা আশংকা দুরিভূত হয়ে গেলে মূল কাজ চালু করা বৈধ।

শিয়াগণ একদিকে জামায়াতের সাথে তারাবিহ্ নামাযকে বিদআত বলছে, অপরদিকে তারা হযরত ওমরের শাহাদত দিবস ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখে শুকরিয়ার নামায আদায় করাকে বিদআত বলে মনে করছে না। অগ্নি উপাসকদের নওরোজ উৎসব পালন করা, মোতা বিবাহ বা সাময়িক অস্থায়ী ও কন্ট্রাক্ট ম্যারেজকে তারা বিদআত বা হারাম বলে মনে করে না। অথচ উম্মতের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী নওরোজ ও মুতা বিবাহ হারাম বলে ইজমা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীন যে প্রথা চালু করেছেন তা বিদআত নয়- বরং সুন্নাত। যেমন- হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক কুরআন সংকলন ও জুমআর দিনের বর্তমান প্রথম আযান প্রচলন এবং হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক ইল্‌মে নাহু বা আরবী ব্যাকরণ চালু ইত্যাদি। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন- "তোমরা

www.sunnibarta.com

আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত বা প্রথাকে মযবুত করে ধরে রাখবে"। সুতরাং চার খলিফা কর্তৃক চালুকৃত সমস্ত কাজই সুন্নাত। (বুখারী)

৩। হযরত ওসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে শিয়াদের অপবাদ ঃ

(ক) শিয়াদের একটি বড় অভিযোগ হলো- "হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে সংকলনের সময় অনেক আয়াত বাদ দিয়েছেন, অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছেন এবং সাহাবীদের ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দিয়েছেন"।

জবাব ঃ নবী করিম (দঃ) কুরআন মজিদ ২৩ বৎসরে খন্ড খন্ড পাতায় লিখিয়ে ছিলেন এবং সাহাবীগণ হেফ্য করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ৩০ পারার ঐসব খন্ডপাতা সংগ্রহ করে কমিটির মাধ্যমে একত্রিত করে একটি জিল্দ্ বা নথি তৈরী করে সংরক্ষণ ও হিফাযত করেন। উক্ত কমিটির প্রধান ছিলেন কাতেবে ওহী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)- এর মাধ্যমে পুনরায় ঐ কপি দেখে ৮টি মাসহাফ বা সংস্করণ তৈরী করে বিভিন্ন প্রদেশে সরকারীভাবে সংরক্ষণ করেন। এ সময় তিনি ত্রিশ পারা, ১১৪ ছুরা, সাত মঞ্জিল ও ৫৫৪ রুকু- ইত্যাদি তরতীব করে ২৭ দিনে রমযানে খতমে তারাবিহ পড়ার সুবিধার্থে সাজিয়ে ছিলেন মাত্র। এতে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন কিছুই করা হয়নি। যিনি রাসুলের যুগে কোরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন- তিনিই হযরত আবু বকর (রাঃ)- এর খিলাফতকালে কুরআনকে এক নথিভুক্ত করেছেন। আবার হযরত ওসমানের (রাঃ) যুগেও তিনিই সংকলন আকারে সাজিয়ে ৮ কপি তৈরী করেছেন। সে সময় থেকে অদ্যাবধি পৃথিবী ব্যাপী হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সর্ব সমর্থিত সংকলিত কুরআন মজিদই অনুসরণ ও তিলাওয়াত হয়ে আসছে। কিন্তু ২০০ বৎসর পর শিয়া ফির্কার প্রাধান্য হলে তারা হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে কুরআন পরিবর্তনের অপবাদ রটনা করে এবং নিজেরা একটি পৃথক কোরআন শরীফ তৈরী করে। তাদের কুরআন শরীফের নাম রাখা হয় মাসহাফে ফাতেমী। তারা বলে- নবী করিম (দঃ)- এর পর বিবি ফাতেমার নিকট ওহী ও কোরআন নাযিল হতো। ঐ কুরআনে সুরা আলী, সুরা ফাতিমা, সুরা বেলায়েত, সুরা হাসনাইন- ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। কোন কোন শিয়া আখড়া বা শিয়া মসজিদে এই কথিত কুরআন দেখা যায়।

হযরত ওসমান (রাঃ) বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব ব্যক্তিগত কপি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন- সেগুলোতে কুরআনের আয়াতের সাথে নবীজীর ব্যাখ্যামূলক কিছু কিছু হাদীসও লিখিত ছিল এবং পঠন ও লিখন পদ্ধতি বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল। ঐ গুলি ছিল ব্যক্তিগতভাবে লিখিত নিজস্ব কপি। এগুলি যদি বহাল রাখা হতো, তাহলে বর্তমানে প্রাপ্ত ইঞ্জিল ও তৌরাত শরীফ- এর মতই বিকৃত হতো।

www.sunnibarta.com

কোরআনের মধ্যে হাদীস মিলিয়ে বিভিন্ন লিখন ও পঠন পদ্ধতি প্রয়োগ এবং স্থানীয় উচ্চারণের পদ্ধতি প্রচলন আরবের বিভিন্ন গোত্র, কুফা, বসরা, ইরান ও তৎসন্নিহিত এলাকার শিয়াদেরই অপকীর্তি ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) সেইসব বিকৃত কপি সরকারীভাবে উদ্ধার করে জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলে ফিতনার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এখন বর্তমান বিশুদ্ধ কোরআন পোড়ানো জায়েয নেই।

(খ) "এছাড়াও হযরত ওসমান (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতি, সরকারী তহ্‌বিলের অপচয়, দোষী প্রমাণিত প্রাদেশিক গভর্ণরদের স্বপদে বহাল রাখা, মারওয়ানের মত দুষ্ট লোককে চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ করা, তার পিতা হাকাম মুনাফিক- যাকে রাসুলুল্লাহ (দঃ) সিরিয়ায় নির্বাসিত করেছিলেন- পুনরায় তাকে মদিনায় এনে পুনর্বাসিত করা, হযরত মুয়াবিয়াকে শামের গভর্ণর নিযুক্ত করা, সরকারী ভূমিতে নিজস্ব উষ্ট্রবহর চড়ানো, কতিপয় সাহাবীকে অন্যায়ভাবে গভর্নরী পদ থেকে চাকুরীচ্যুত করা- ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ শিয়ারা রটনা করেছে"।

এই অপবাদের মাধ্যমে শিয়ারা বিরাট রাজনৈতিক ফায়দা লাভ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে তারা শিয়া সুন্নীর বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। বর্তমানেও ইরানে খোমেনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে ঐসব ফিৎনাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ইরানে সুন্নী মুসলমানকে অমুসলিম- সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হয়েছে। হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানকে বিভিন্ন অজুহাতে কতল করা হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। শিয়াদের এসব বানোয়াট অভিযোগকে ভিত্তি করেই বর্তমানে ইতিহাস লিখিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) রাসুল (দঃ) কর্তৃক বেহেস্তের সনদ প্রাপ্ত, দুই কন্যার জামাতা হওয়ার গৌরব লাভকারী জিন্‌নুরাইন উপাধীপ্রাপ্ত, জুলহায়া, দুই বেহেস্তের মালীক বলে নবীজীর স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং খোদা তায়ালা কর্তৃক গুনাহর পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হিসাবে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বার বৎসর পর্যন্ত নবীজীর আদর্শে খিলাফত পরিচালনাকারী খলিফা ছিলেন। সুতরাং শিয়াদের অভিযোগসমূহ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ প্রসূত ছিল।

আহলে সুন্নাতের একটি মৌলিক আক্বীদা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আলামাতুছ ছুন্নাতে ছালাছুন ঃ তাফ্‌দীলুশ শাইখাইন, হুববুল খাতানাইন, মুসিহ্ আলাল খুফ্‌ফাইন"। অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের তিনটি প্রধান আলামত হলো (ক) শাইখাইন বা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) কে সমস্ত উম্মতের উপর প্রাধান্য দেয়া (খ) খাতানাইন- অর্থাৎ দুই জামাতা- হযরত ওসমান ও আলীকে সমান ভালবাসা এবং (গ) মোজার উপর মাসেহ করা"।

শিয়াগণ উপরোক্ত তিনটি বিষয়কেই অস্বীকার করে। শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ঐ সময় প্রধান প্রভেদ ছিলো উপরোক্ত ৩টি বিষয়। প্রতিটি বাতিল ফির্কার

www.sunnibarta.com

বিরুদ্ধে সুন্নী আক্বীদা ভিন্নতর। সুতরাং বাতিল আক্বীদার সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, সুন্নী আক্বীদার সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকবে। যেমনঃ ওহাবী ফির্কা ও মউদুদী ফির্কার বাতিল আক্বীদার সংখ্যা প্রধানতঃ সত্তর (৭০) ও একশত এগার (১১১)। এর বিপরীতে সুন্নী আক্বীদাও সত্তর এবং একশত এগারটি।

"রাসুল মাটির তৈরী, রাসুলের খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব ছিলনা, তিনি হাজির নাজির নন"- এই তিনটি হলো বর্তমান ওহাবীদের ও ফুরফুরার আবদুল কাহহারের বাতিল আক্বীদা। এর বিপরীতে সুন্নী আক্বীদা হলো- "রাসুল নূরের সৃষ্টি, রাসুলের খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়ব ছিল, রাসুল হাজির ও নাজির"। মূল কথা হলো- যুগে যুগে বাতিল মতবাদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে- সুন্নী আক্বীদার সংখ্যাও আনুপাতিক হারে প্রকাশিত হতে থাকবে।

৪। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে শিয়াদের মিথ্যা তোহ্‌মত ঃ

(ক) হযরত ওসমান (রাঃ) কে মদিনায় বিদ্রোহী কর্তৃক ঘেরাও অবস্থায় রেখে হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মক্কা শরীফে হজ্ব করতে চলে যান। হজ্ব সমাপন শেষে তিনি মদিনায় না এসে বসরার দিকে চলে যান। তাঁর সাথে ১৬ হাজার লোক-লস্কর ছিল। হযরত আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। অথচ কুরআনে এভাবে ঘুরাফেরা করা উম্মুল মুমিনীনদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে। যেমন সুরা আহযাবের ৩২ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো।" আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আপন ঘরে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন- অথচ হযরত আয়েশা (রাঃ) আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব হচ্ছে ঃ উম্মুল মুমিনীনগণের জন্য যদি সদা সর্বদা ঘরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ হতো- তাহলে উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরও নবী করীম (দঃ) তাঁদেরকে নিয়ে হজ্ব, ওমরা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন কিভাবে? তাঁদের পিতা-মাতার বাড়ীতে পাঠালেন কি করে? আত্মীয়-স্বজনদের অসুখ-বিসুখে সেবা করার জন্য প্রেরণ করলেন কেন?

এতে বুঝা গেল-বিনা প্রয়োজনে ঘুরা-ফেরা করাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বৈধ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়নি। শিয়ারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। **আয়াতের মর্মার্থ হলো- "বিনা পর্দায় অলিগলিতে এবং বাজারে জাহিলিয়াত যুগের সাধারণ নারীদের মত তাঁরা যেন চলাফেরা না করেন"**। শিয়াদেরই শ্রদ্ধেয়া জননী এবং মুসলিম নারীগণের ভূষণ

www.sunnibarta.com

হযরত বিবি ফাতিমা (রাঃ) প্রতি শুক্রবারে পর্দা সহকারে মদিনার তিন মাইল দূরে ওহোদ ময়দানে পায়ে হেঁটে গিয়ে হযরত আমির হামযার (দাদার ভাই) মাযার যেয়ারত করতেন। শিয়ারা এর কি জবাব দেবেন? তাদের কিতাবেও বিশ্বস্ত সূত্রে বিবি ফাতিমার এ ঘটনা বর্ণিত আছে। তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কেন?

(খ) তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ)- এর প্রতি হিংসাপরায়ণা ছিলেন। বিবি খাদিজার (রাঃ) নাম শুনলে তিনি জ্বলে উঠতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "নবী করিম (দঃ)- এর বিবিগণের মধ্যে কোন বিবির প্রতি আমি এত ঈর্ষাপরায়ণা ছিলাম না- যত ছিলাম বিবি খাদিজা (রাঃ)- এর প্রতি- অথচ আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু নবী করিম (দঃ) তাঁর কথাই বেশী স্মরণ করতেন"।

শিয়াদের এই অপবাদের জবাব ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)- এর গায়রত বা ঈর্ষা প্রকাশ স্বয়ং নবী করিম (দঃ)- এর সম্মুখে ছিল। যদি তা দোষণীয় হতো- তাহলে তিনিই মালামত করতেন। অথচ এর কোন প্রমাণ নেই। স্বামী হয়ে নবী করিম (দঃ) নিজ স্ত্রীর কোন দোষ দেখলেন না- অথচ শিয়ারা নিজ মায়ের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে? তারা কেমন সন্তান- তা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো- নবী করিম (দঃ) বিবি খাদিজার (রাঃ) কথা স্মরণ করে অঝোরে কাঁদতেন। অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রাঃ) মনে করতেন- হয়তো নবী করিম (দঃ) তাঁকে বেশী ভালবাসেন না। স্বামীর অধিক ভালবাসা প্রাপ্তিই ছিল তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য। এটা নিন্দনীয় হতে পারে না। তদুপরি স্বপত্নীদের প্রতি ঈর্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন নবী করিম (দঃ) অন্যান্য বিবিগণের চাইতে হযরত আয়েশাকে বেশী ভালবাসতেন। তিনি বলতেন- "হে আল্লাহ! আমি এ ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতে অক্ষম"। শরীয়তে অন্যান্য হকের ও অধিকারের বেলায় সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ভালবাসা বা মনের আকর্ষণের উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়নি।

(গ) শিয়াদের তৃতীয় অপবাদ হলো ঃ "বিবি আয়েশা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরে অনুশোচনা করে নিজেই বলেছেন- "হায়! আমি আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম- তাহলে কতই না ভাল হতো।" এতে বুঝা যায়- "তিনি অন্যায় করেছেন" (নাউযুবিল্লাহ্)।

শিয়াদের এই অপবাদের প্রথম জবাব ঃ হযরত আলীও তো উষ্ট্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষের শহীদগণকে দেখে আফসোস করে বলেছিলেন- "হায়! আমি যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম! তাহলে কতই না ভাল হতো"- শিয়াগণ এর কি জবাব দেবেন? এরূপ বলা দোষের হলে উভয়কেই দোষী বলতে হবে। পারবে কি ওরা তা বলতে?

প্রকৃত জবাব হলো ঃ কোন দূর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করা এবং নিজের কার্য্যাবলীর জন্য অনুশোচনা করা ঐ কাজের অবৈধতার প্রমাণ বহন করে না। হযরত আলী (রাঃ) ও বিবি আয়েশা (রাঃ) উভয়েই যুদ্ধের অহেতুক ক্ষয়ক্ষতির জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। নিজেদের অপরাধ বা ভুলের জন্য নয়। বাতিল বলতে হলে উভয়কেই বলতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ্)।

www.sunnibarta.com

ষষ্ঠ পর্ব

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে শিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদা ঃ

১। শিয়াদের মতে হযরত আলী (রাঃ)- এর প্রতি ভালবাসা মুক্তি ও নাজাতের জন্য যথেষ্ঠ। শিয়াদের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বাবুওয়াই কুমী (কুম শহরের অধিবাসী) মুফাদ্দাল ইবনে আমরের সুত্রে ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)- এর কথিত মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন ঃ "একদিন মুফাদ্দাল আবু আবদুল্লাকে (ইমাম জাফর সাদেকের কুনিয়াত) জিজ্ঞাসা করলো- হযরত আলী কেমন করে বেহেস্ত ও দোযখের বন্টনকারী হলেন? উত্তরে ইমাম আবু আবদুল্লাহ বললেন- "হযরত আলীর মহব্বতের নামই ঈমান এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষের নামই কুফর। বেহেস্ত সৃষ্টি হয়েছে ঈমানদারের জন্য এবং দোযখ সৃষ্টি হয়েছে কাফিরদের জন্য। অতএব পরোক্ষভাবে হযরত আলীই বেহেস্ত ও দোযখ বন্টনকারী। তাঁর প্রেমিক ব্যতিত অন্য কেউ বেহেস্তে যাবে না এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী ব্যতীত অন্য কেউ দোযখে যাবে না"।

জবাব ঃ উক্ত বর্ণনা মিথ্যা। কেননা, কুরআন হাদীসের পরিপন্থী কোন কথা ইমাম বংশের কেউ বলতে পারেন না। তদুপরি- তাদের সূত্রমতে ফেরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদ- তারাও দোজখে যাবে না। কেননা, তারা আলীকে চোখেও দেখে নাই- বিদ্বেষ পোষণ করবে কখন?। অথচ কোরআন হাদীসের ভাষ্য মতে তারা জাহান্নামী।

২। শিয়া মুহাদ্দিছ বাবুওয়াই আর একটি মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে হযরত আলীকে নবী করিম (দঃ)- এর উপর মর্যাদা দিয়েছে। সে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেঃ "নবী করিম (দঃ) বলেছেন- আমার নিকট জিবরাইল (আঃ) এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ আমাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন যে, মুহাম্মাদ (দঃ) হলেন আমার প্রেরিত নবী ও আমার রহমত। আর আলী হলেন আমার হুজ্জাত বা দলীল ও প্রমাণ। যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসবে- তাকে আমি শাস্তি দেবোনা- যদিও সে আমার নাফরমানী করুক না কেন। আর যে ব্যক্তি আলীর সাথে দুশমনি করবে- তাকে আমি রহম করবোনা- যদিও সে আমর অনুগত হোক না কেন"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

জবাব ঃ উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, নবুয়ত ও রহমতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে মুহাম্মাদ (দঃ) কে- আর হুজ্জাত বা দলিল প্রমাণ- এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে হযরত আলী (রাঃ) কে। হুজ্জাত- এর মর্তবা নবুয়ত ও রহমতের উপরে। আল্লাহর নাফরমানী করে

www.sunnibarta.com

আলীর মহব্বত পোষণ করলেই শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে- এটা ইসলাম পরিপন্থী কথা। কোরআনে আছে "যারা আল্লাহ ও রাসুলের নাফরমানী করবে- তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্ট" (সুরা আহযাব) আলীর নাফরমানীর কথা কুরআনে নেই।

৩। শিয়াদের নির্ভরযোগ্য নেতা হাসান ইবনে কাবাশ নবী করিম (দঃ)- এর নামে একখানা মনগড়া হাদীসে বলেছে ঃ নবী করিম (দঃ) আলী সম্পর্কে দীর্ঘ এক হাদীসের শেষে নাকি বলেছেন- "আলী পরকালে দোযখের পিঠে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রেমিকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন এবং তাঁর বিরূদ্ধবাদীদেরকে দোযখে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। অতঃপর বেহেস্তের দরজায় গিয়ে যাকে ইচ্ছা বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন।" (নাউযুবিল্লাহ্)।

জবাব ঃ এই কথিত হাদীসে তো প্রমাণিত হলো যে, হযরত আলীর কোন কোন প্রেমিকও প্রথমে দোযখে যাবে। পরে আলী (রাঃ) তাদেরকে দোযখ থেকে উদ্ধার করে আনবেন। অথচ শিয়া নেতার (বাবুয়াই) ২ নং বর্ণনায় বলা হয়েছে- হযরত আলীর প্রেমিক শাস্তি পাবে না আর ৩নং নেতার (কাবাশ) বর্ণনায় দেখা যায়- কেউ কেউ দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর খালাস পাবে-হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন। সুতরাং উভয়টিই অসংলগ্ন ও পরস্পর বিরোধী কথা।

www.sunnibarta.com

শিয়াদের পৃথক আচার অনুষ্ঠান ও পৃথক শরীয়তী বিধান ঃ

শিয়াগণ আচার অনুষ্ঠান ও শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব পৃথক মতবাদ ও মসআলা-মাসায়েল তৈরী করেছে। এগুলো তাদের নিজস্ব ফিকাহ্‌র কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। শাহ আবদুল আজিজ দেহ্‌লভী (রহঃ) এগুলোর একটি তালিকা "তোহ্‌ফায়ে ইস্‌না আশারিয়া" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। সেখান থেকে কিছু নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। ঈদে গদীরে খূম ঃ ১১ হিজরীতে বিদায় হজ্ব থেকে মদিনা শরীফে প্রত্যাবর্তন কালে যিলহজ্বের ১৮ তারিখে পথিমধ্যে 'গদীরে খূম' নামক স্থানে নবী করিম (দঃ) সাহাবীগণকে একত্রিত করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত ভাষণের এক পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেছিলেন "মান্ কুন্‌তু মাওলাহু, ফা-আলীউ মাওলাহু" (বুখারী)। অর্থাৎ- আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা"।

হযরত আলী (রাঃ) কে এইদিন মাওলা উপাধী দান করায় শিয়াগণ মনে করেছে- নবীজীর পরবর্তী খলিফা হযরত আলী ছাড়া অন্য কেউ নয়। তাই শিয়ারা এই দিনকে তাদের ঈদের দিন হিসাবে পালন করে থাকে। এই দিনের ঈদকে ঈদুল ফিতর ও ঊদুল আয্‌হা হতেও তারা উত্তম মনে করে এবং "ঈদে আক্‌বার" বলে স্বীকৃতি দেয়। তাই শিয়ারা জিলহজ্ব চাঁদের ১৮ তারিখে "ঈদে গদীরে খুম" ধুমধামের সাথে পালন করে। কেননা, এই দিনেই "গদীরে খূম" এর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদত্ত হয়েছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) কে তাদের মতে হুযুর (দঃ)-এর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা হয়েছিল।

২। ঈদে বাবা সুজাউদ্দিন ঃ হযরত ওমর (রাঃ)- এর হত্যাকারীর নাম আবু লুলু। সে ছিল অগ্নি উপাসক। হযরত ওমর (রাঃ)- এর দরবারে আবু লুলু তার মনিবের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে মামলায় হেরে যায়। এতে সে প্রতিজ্ঞা করে- হযরত ওমর (রাঃ) কে সে শহীদ করবে। এরই ফলশ্রুতিতে ২২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ২৮ তারিখে আবু লুলু মজুসী মসজিদে নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ)- এর পিঠে ছুরিকাঘাত করে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহে.....। শিয়াগণ আবু লুলুর এই বীরত্বপূর্ণ (?) কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বৎসর ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখে আবু লুলু স্মরণে ঈদ পালন করে থাকে। আবু লুলুকে শিয়ারা "বাবা

www.sunnibarta.com

সুজাউদ্দিন" (দ্বীনের বীর) বলে সম্বোধন করে এবং তার স্মৃতি স্মারক হিসাবে উক্ত ঈদের নাম রাখে "ঈদে বাবা সুজাউদ্দিন" (নাউযুবিল্লাহ্)। শিয়াদের ধর্মগুরু আলী ইবনে মাযাহের ওয়াসেতী- আহমদ ইবনে ইসহাক কুমী-এর সূত্রে বর্ণনা করেছে যে- আহমদ ইবনে ইসহাক কুমী (কুম শহরের অধিবাসী) বলেছেঃ "ঈদে আবু লুলু বা ঈদে বাবা সুজাউদ্দিন-এর এ দিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন, গৌরবের দিন, পবিত্রতা অর্জনের মহান দিন, বরকতের দিন এবং সর্বোপরি- আত্মতৃপ্তির দিন"। উক্ত আহমদ ইবনে ইসহাক কুমী সর্বপ্রথম এই ঈদের প্রচলন করে। তার অনুসারীরা পরবর্তীকালে নিয়মিতভাবে এই ঈদ পালন করতে থাকে। এরা বলে- পূর্ববর্তী তাদের ইমামগণ নাকি উক্ত ঈদ পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা অগ্নী উপাসকদের ঈদ বা আনন্দ দিবস। কেননা, তাদেরই লোক হযরত ওমর (রাঃ) কে শহীদ করেছিল।

৩। নওরোজ উৎসব পালন ঃ ইরানের অগ্নী উপাসকরা আবহমানকাল থেকে নওরোজ উৎসব পালন করে আসছে। এটা অগ্নী উপাসকদের ধর্মীয় উৎসব। শিয়াগণ নববর্ষের এই দিনকে সম্মান করে। বিধর্মীদের উৎসব পালন করা কুফরী।

মুহাজ্জাব গ্রন্থে ইবনে ফাহ্দ বর্ণনা করেন- "এইটি অগ্নী উপাসকদের শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় দিবস"। বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ নওরোজ দিবসে জনৈক ব্যক্তি কিছু মিঠাই ও ফালুদা নিয়ে কুফায় হযরত আলী (রাঃ)- এর খিদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করে। এই মিঠাই ও ফালুদা পেশ করার কারণ জানতে চাইলে উক্ত ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ) কে এটা নওরোজের হাদিয়া বলে জানায়। হযরত আলী (রাঃ) ঘৃণাভরে ঐ মিঠাই ও ফালুদা প্রত্যাখ্যান করে বললেন- মুসলমানের প্রতিদিনই নওরোজ বা নূতন দিন। শিয়াগণ অগ্নী উপাসকদের এই দিবসকে সম্মান করে এবং নিজেরাও পালন করে- অথচ হযরত আলী (রাঃ) এই দিনকে ঘৃণা করতেন। বিধর্মীদের ধর্মীয় কাজের অনুসরণ করা নিষিদ্ধ ও কুফরী।

৪। শাসকদের সিজদা করার প্রথা ঃ শিয়া আলিমগণ যালেম শাসক বা বাদশাহ্ কে সিজদা করার প্রথা চালু করে। শিয়া আলিম বাকের মজলিশী ও অন্যান্য শিয়া ইমামগণ এই প্রথা চালু করেন।

সম্ভবতঃ দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট আকবর "দ্বীনে ইলাহী" প্রবর্তন করে তাদের অনুকরণে এই সিজ্দা প্রথা পূনঃ চালু করেছিলেন। কেননা, তাঁর মা হামিদা বানু, প্রধানমন্ত্রী বৈরাম খান, আবুল ফ'যল, ফৈজী, শেখ মুবারক, আবদুর রহমান খানে খানান, নবরত্ন ও উজির নাজির- তারা সবাই ছিলেন শিয়া। কাজেই "দ্বীনে ইলাহীর" উপর শিয়াদের প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। শিয়াদের প্রভাবপুষ্ট দ্বীনে ইলাহীকে

www.sunnibarta.com

ধ্বংস করার জন্য মুজাদ্দিদে আল্‌ফিসানী, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী, আবদুল কাদির বদায়ুনী, মোল্লা দো-পেয়াজা- প্রমূখ সুন্নী আলিমগণ ও পীর মাশায়েখগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইসলামে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার বিধান নেই। ইবাদতের নিয়তে মানুষকে সিজদা করা শির্ক এবং তাযীমী সিজ্‌দা করা কবিরা গুনাহ্। উভয়টিই নিষিদ্ধ। নবী করিম (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কারও সিজদা গ্রহণ করেননি। ইসলামে সিজদার পরিবর্তে সালাম প্রথা চালু হয়েছে।

৫। শারাব হালাল ও পবিত্র ঃ শিয়াগণের ইমাম ইবনে বাবুওয়াই, জু'ফী ও ইবনে আকিল- প্রমূখ ফক্‌িহগণের মতে শরাব পবিত্র এবং হালাল। (অথচ- কুরআনের দ্বারা ইহা হারাম প্রমাণিত)।

৬। মজি ও অদী ঃ "শিয়াদের মতে শারিরীক উত্তেজনায় পুরুষের মজি ও ওদী (পাতলা বীর্য ও ঘোলা প্রস্রাব) বের হলে অজু নষ্ট হয়না"।

শরীয়তের বিধান হলো- বীর্য বা মনি নির্গত হলে গোসল করা ফরয। আর মজী ও অদী নির্গত হলে শুধু অজু করা ফরয।

৭। ঈদে নওরোজ ঃ নওরোজের দিন (অগ্নী উপাসকদের ঈদের দিন) গোসল করা শিয়াদের মতে সুন্নাত।

আরব দেশে নওরোজ ছিলনা এবং এখনও নেই। কাজেই সুন্নাত হওয়ার দাবীটাই মিথ্যা।

৮। রক্তমাখা কাপড়ে নামায ঃ শিয়াদের বিধানে শরীর থেকে নির্গত রক্ত- পুঁজ ইত্যাদিতে পরিধানের পোশাক নষ্ট হলেও তাতে নামায পড়া বৈধ। কিন্তু আহ্‌লে সুন্নাতের ইমামগণের মতে রক্তমাখা কাপড়ে নামায অশুদ্ধ।

৯। কেবলামূখী হওয়া ঃ "শিয়াদের বিধানে নফল নামায এবং তিলাওয়াতের সিজদায় কেবলামূখী হওয়া জরুরী নয়। যেকোন দিকে মুখ করে নফল পড়া ও সিজদায়ে তিলাওয়াত করা তাদের মতে বৈধ"। শিয়াদের এই মত শরীয়ত বিরোধী। প্রত্যেক নামাযে এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতে কিবলামূখী হওয়া প্রধান শর্ত।

১০। নাপাক জায়গায় নামায ঃ "নামাযের জায়গায় শুকনা পায়খানা থাকলে এবং মুছল্লীর শরীরে বা কাপড়ে লাগলে শিয়াদের মতে নামায শুদ্ধ হবে"। সুন্নীমতে- নামাযের জায়গা পাক হওয়া ফরয।

১১। নামাযে চলাফেরা করা ঃ "শিয়াদের মতে মুসল্লীরা নামাযরত অবস্থায় দশ গজের মধ্যে ঘরে যাতায়াত করতে পারবে"। সুন্নীমতে- নামাযের মধ্যে আমলে কাছির (নামাযের বাইরের কাজ) নামায ভঙ্গের প্রধান কারণ। ঘরে যাতায়াত করাও আমলে কাছির।

www.sunnibarta.com

১২। নামাযে ছানা অবৈধ ঃ নামাযের মধ্যে "ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা" পাঠ করলে শিয়া বিধানে নামায শুদ্ধ হবে না। সুন্নীমতে- উক্ত ছানা পাঠকরা সুন্নাত এবং সুরা জ্বীনে "ওয়া আন্নাহু তায়ালা জাদ্দু রাব্বিনা"- কুরআনের আয়াত। সুতরাং যে কোন স্থান থেকে পাঠ করাই বৈধ"। উক্ত বাক্য পাঠে নামায ভঙ্গ হবে কেন?

১৩। নামাযে পানাহার করা ঃ শিয়াদের নির্ভরযোগ্য ফিকাহ্‌র কিতাব "শারায়িউল আহ্‌কাম" এ উল্লেখ আছে- "নামাযের ভিতর পানাহার করা জায়েয"।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে নামাযরত অবস্থায় পানাহার করা নিষেধ ও হারাম। ইহাই সুন্নী আক্বীদা।

১৪। নামাযরত মহিলার সাথে অশ্লীল আচরণ ঃ "শিয়াদের নেতৃস্থানীয় ফকিহ্ তুসী, আবু জাফর ও অন্যান্য শিয়া উলামাদের মতে নামাযরত অবস্থায় সুন্দরী কোন মহিলাকে ঝাপটে ধরে নিজ লিঙ্গ নারীস্থানের বরাবর লাগিয়ে ঘষা দিলে এতে যদি মজি বের হয়- তাতে নামায নষ্ট হবে না"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

সুন্নীমতে এ ধরনের কাজ অন্য সময়ও অপরাধ এবং জঘন্য পাপ। নামাযরত অবস্থায় খোদার সম্মুখে এমন বেহায়া কাজ করা জঘন্যতম অপরাধ।

১৫। একসাথে দুই ওয়াক্তের নামায ঃ "শিয়াদের মতে কোন ওযর বা সফর ছাড়াই যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা এক সাথে আদায় করা জায়েয"।

সুন্নীমতে- আরাফাতের ময়দানে হজ্বের দিনে মসজিদে নামিরায় জামাতে অংশগ্রহণকারী হাজীগণই কেবল যোহর ও আছর এক সাথে আদায় করতে পারবেন। মোজদালেফায় মাগরিব ও এশা এক সাথে এশার সময় মসজিদে মাশ্‌আরিল হারামে আদায় করতে পারবেন। আরাফাতের ময়দানে যারা মসজিদে না গিয়ে তাঁবুতে নামায আদায় করবেন- তারা একসাথে যোহর- আছর আদায় করতে পারবেন না। পৃথক সময়ে পড়তে হবে।

১৬। ব্যবসায়ীদের জন্য কছর নামায নাই ঃ "শিয়াদের মতে ব্যবসা উপলক্ষে সফর করলে নামায কছর পড়া যাবে না, কিন্তু রোযা ভঙ্গ করা যাবে। ইবনে ইদ্রিছ, ইবনে মো'লেম, তুসী- প্রমূখ শিয়া ওলামাগণ এই মতের পক্ষে"।

সুন্নী মাযহাব মতে- "সব ধরনের সফরেই নামায কছর পড়তে হবে এবং রোযা ভঙ্গ করার এখতিয়ার আছে। পরে ক্বাযা করতে হবে।"

১৭। মাতম ও কপাল চাপড়ানো ঃ শিয়া মাযহাব মতে মৃত ব্যক্তির শোক প্রকাশ করার বেলায় পুরুষদের ক্ষেত্রে পিতা, ছেলে ও ভাই- এর জন্য জামা ও কাপড় চোপড় ছিঁড়ে কান্না-কাটি করা এবং নারীদের ক্ষেত্রে যেকোন মৃত ব্যক্তির জন্য অনুরূপ শোক করা জায়েয"।

www.sunnibarta.com

সুন্নীমতে- হাদীসে আছে- "যারা শোকে চুল ছিড়ে অথবা কাপড় ছিঁড়ে- তারা আমার দলভূক্ত নয়।" অন্য হাদীসে আছে- "যে ব্যক্তি জামা কাপড় ছিঁড়ে অথবা কপাল চাপড়ায়, সে আমার দলের নয়।" এ কাজ জাহিলী যুগের আচার আচরণ। ইহাই আহলে সুন্নাতের আক্বীদা।

১৮। আছর পর্যন্ত রোযা ঃ "শিয়াধর্ম মতে- আশুরার রোযা ভোর হতে আছর পর্যন্ত মুস্তাহাব"।

সুন্নীমতে তাদের এই বিশ্বাস কোরআনের পরিপন্থী। কেননা, কোরআনে আছে- "সুর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো"।

১৯। গাদীরে খুম রোযা ঃ "জিলহজ্ব চাঁদের ১৮ তারিখে "গাদীরে খুম" দিবসে রোযা রাখা শিয়াদের মতে ছুন্নাত"।

সুন্নীমতে- নবীগণ, সাহাবীগণ বা ইমামগণ যে কাজ করেননি- তা ছুন্নাত নয়। শিয়ারা ঐ দিন হযরত আলীর (রাঃ) জন্য রোযা রাখে। হযরত আলী কি ঐ দিন রোযা রাখতেন?

২০। ই'তেকাফ ঃ "শিয়াদের মতে যে মসজিদে নবী করিম (দঃ) অথবা হযরত আলী (রাঃ) জুমা প্রতিষ্ঠা করেছেন- সে মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে ইতেকাফ করা জায়েয নয়"।

সুন্নীমতে তাদের এই ধারণা কোরআনের খেলাফ। কোরআন বলে, "যে কোন মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রী গমন করতে পারবে না। এখানে সব মসজিদের কথাই বলা হয়েছে। তাদের কথা সঠিক হলে অল্প কয়টি মসজিদেই ই'তিকাফ করা যাবে।

২১। জিহাদ ঃ "শিয়াদের মতে- জিহাদ কেবল রাসুলের সাথী, হযরত আলীর যুগের লোক, ইমাম হাসানের ছয় মাস খিলাফতকালের লোক, ইমাম হোসাইনের সঙ্গী ও ইমাম মাহ্দীর সঙ্গীদের উপরই ফরয। অন্য যুগে বা অন্য কোন লোকের উপর জিহাদ ফরয নয়"।

-এ কারণেই পাক ভারতের গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী এবং ইরানের বাহাউল্লাহ ইরানী- উভয়েই নবুয়ত দাবী করে ইংরেজদের বিরূদ্ধে জিহাদ হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছিল। মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী বলেছেন- "কাফিরছে লড়না হারগেজ দুরস্ত নেহী"- অর্থাৎ কাফিরদের সাথে জিহাদ করা একেবারেই দুরস্ত নয়। অথচ- নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন- "জিহাদ ও নিয়্যাত কিয়ামত পর্যন্ত ফরয"। ইহাই সুন্নী আক্বীদা।

২২। বিবাহ ঃ "শিয়াদের মতে- আত্মসংযম এবং ফিতনার ভয়- উভয় অবস্থায়ই বিবাহ না করা মুস্তাহাব"।

www.sunnibarta.com

সুন্নীমতে শিয়াদের এই ধারণা নবী ও ইমামগণের সুন্নাতের পরিপন্থী এবং প্রকৃতিরও বিরুদ্ধাচরণ। বৈধ বিবাহে তারা অনুৎসাহী হলেও অবৈধ মুত্আর নামে সাময়িক বিবাহ বন্ধনে শিয়ারা খুবই আগ্রহী।

২৩। অন্য পথে যৌন ক্রিয়া ঃ "বিবাহিতা স্ত্রী অথবা বাঁদী দাসীর সাথে পায়খানার রাস্তায় যৌন ক্রিয়া করা শিয়াদের মতে জায়েয"।

হাদীসে এসেছেঃ "যে ব্যক্তি পায়খানার রাস্তায় স্ত্রী সঙ্গম করে- সে অভিশপ্ত।" (বুখারী ও মুসলিম)। সুতরাং অন্য পথে যৌনক্রিয়া হারাম। ইহাই সুন্নী মত।

২৪। মুত্আ বিবাহ ঃ "ভোগ বিলাসের উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে কোন নারীকে কিছু সময়ের জন্য বিবাহ করা শিয়াদের ধর্মে জায়েয"।

তাদের মতে মুত্আ উত্তম ইবাদত। মুত্আ বিবাহের ফযিলত সম্পর্কে শিয়াদের অনেক মওযু ও মনগড়া হাদীস রয়েছে। "ফিক্হে জাফরী" নামক তাদের ইসলামী আইন গ্রন্থে মুত্আ বিবাহ হিন্দু মুসলমান, অগ্নী উপাসক, নির্বিশেষে সকল নারীর সাথেই বৈধ। শিয়াদের মতে- "মুত্আ দাওরিয়া" জায়েয। অর্থাৎ- একই নারীকে সম্মিলিতভাবে বিবাহ করা এবং পালাক্রমে উপভোগ করা জায়েয"। (নাউযুবিল্লাহ্)।

"ইসনা আশারিয়া" শিয়াগণের মুহাক্কিক পন্ডিতগণ তাদের কিতাবে এ ধরনের মুত্আ বিবাহের বৈধতা স্বীকার করলেও সাধারণ শিয়াগণ এর বৈধতা স্বীকার করে না। ইসলামে মুত্আ বিবাহ ব্যাভিচারেরই নামান্তর। সমাজ সভ্যতার লক্ষ্যে এবং রক্তের পবিত্রতা ও বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে নারী পুরুষের বৈধ স্থায়ী বন্ধনকে শরীয়তে 'বিবাহ' বলে। অস্থায়ী বা টেম্পরারী কোন বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়। আরবের জাহিলী যুগের মুত্আ বিবাহকে নবী করিম (দঃ) ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কেননা, মুত্আ বিবাহ হলে তার মা-বোন খালা, নানী, বেটী-নাত্নী- ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না। কালের প্রবাহে হয়তো ঐ মহিলারই কন্যা সন্তান বা অধঃস্তন অন্য কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে দৃষ্টি করলে ঐ মহিলার মা, মেয়ে, খালা, ফুফু ও অন্যান্য মাহারেম মহিলাকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যাবে। এটাকে কুরআন ও হাদীসের ভাষায় "হুরমত বিল মুসাহারাত" বলা হয়। কামদৃষ্টি ও তজ্জনিত উদ্ভূত হারাম পরিস্থিতি থেকে এবং সামাজিক বৈবাহিক জটিলতা থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম পর্দা বা হিযাবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। মুত্আ বিবাহ বৈধ করণের মাধ্যমে শিয়া সমাজকাঠামো সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। হালাল হারামের কোন পার্থক্যই তাদের মধ্যে নেই।

www.sunnibarta.com

অষ্টম পর্ব

শিয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ঃ

শিয়া সম্প্রদায় একটি বিশ্বাসঘাতক সম্প্রদায়। তারা প্রথমে তাদের ইমাম হযরত আলী (রাঃ), ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে সমর্থন করে যুদ্ধে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরে ভয়ে অথবা লোভে পড়ে তাঁদেরকে পরিত্যাগ করে। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে এই শিয়ারাই হযরত আলী (রাঃ) থেকে পৃথক হয়ে খারিজী নাম ধারণ করে এবং তাদের মধ্য হতে ইবনে মুলজেম তাঁকে শহীদ করে। হযরত আলী (রাঃ)- এর পর ইমাম হাসান (রাঃ) খলিফা হলে ইমাম হাসানের পক্ষের শিয়ারাই টাকার লোভে তাঁর দল থেকে সরে দাঁড়ায়। তাই ইমাম হাসান (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে খেলাফত হস্তান্তর করে নিজে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। শিয়াদের গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হয়ে গোটা ইমাম পরিবার কুফা থেকে মদিনায় চলে আসেন।

ইয়াযিদের রাজত্বকালে কুফার শিয়াগণই আবার ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে কুফায় দাওয়াত করে খিলাফত- গ্রহণের জন্য হাজার হাজার পত্র প্রেরণ করেছিল দূত মারফত। তাদের পত্র ও দাওয়াত পেয়েই ইমাম হোসাইন (রাঃ) সপরিবারে কুফায় রওয়ানা হন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাপিষ্ট ইয়াযিদ কুফাবাসীকে খরিদ করে নেয় এবং ইমামের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। এরাই কুফার শাসক ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইনের (রাঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়। এদের মধ্যেই ছিল সীমার ও হোর। ইমাম হোসাইন (রাঃ) এই শিয়াদের লক্ষ্য করেই কারবালায় বলেছিলেন- "হে কুফাবাসীগণ! তোমরা কি আমাকে দাওয়াত করে আনো নি? আজ কেন আমার বিরুদ্ধে লড়তে এসেছো?" তখন তারা এর কোন উত্তর দেয়নি।

সুতরাং এই শিয়ারাই তাদের তিন ইমামের সাথে গাদ্দারী করে তিনজনকেই শহীদ করার ব্যবস্থা করে। অথচ এই শিয়ারাই আজকাল হায় হাসান, হায় হোসাইন- বলে বুক চাপড়ায় এবং মাতম করে। এ যেন গলায় পা চেপে বুক মালিশ করা। দুষ্ট লোকের হাতে পড়ে ইতিহাস এমনিভাবেই বিকৃত হয়ে যায়।

www.sunnibarta.com

নবম পর্ব

পবিত্র আহ্‌লে বাইতের ফযিলত ঃ

ভূমিকা ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সমস্ত নবীগণের সরদার, হুযুরের পবিত্র আহলে বাইতও তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীগণের আহলে বাইতের সরদার। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণও পূর্ববর্তী নবীগণের সাহাবাদের সরদার। হুযুরের সম্মানিত পিতা-মাতা সমস্ত নবীগণের পিতা-মাতার সরদার। তবে যেসব পিতা নবী ছিলেন- তাঁদের ফযিলত অবশ্যই উর্দ্ধে। হুযুরের পবিত্র শহর অন্যান্য নবীগণের শহর হতে উত্তম। হুযুরের রওযা মোবারক অন্যান্য নবীগণের রওযা মোবারক হতে উত্তমতো বটেই- বরং আরশ মোয়াল্লা হতেও অধিক উত্তম (ফতোয়ায়ে শামী)। মোট কথা- হুযুরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব বস্তুই অন্যান্য সবকিছু থেকে উত্তম। ইহাই সার কথা। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আহ্‌লে বাইতও সকল আহ্‌লে বাইতের চেয়ে অধিক উত্তম। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে আহলে বাইতের অসংখ্য ফযিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আহলে বাইতের ফযিলত ও পরিধি ঃ

১। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লি-ইউযহিবা আ'নকুমুর রিজ্‌ছা আহ্‌লাল বাইতি! ওয়া ইউতাহ্‌হিরাকুম তাত্বহীরা।" (সুরা আহযাব- ৩৩ আয়াতের অংশ বিশেষ)

অর্থ ঃ "হে আহলে বাইত (নবীর পরিবারবর্গ)! আল্লাহ্ তো ইহাই চান যে, তোমাদেরকে অপবিত্রতা থেকে দুরে রাখেন এবং তোমাদেরকে উত্তমরূপে পাক-পবিত্র করেন"। (হুযুরের আহলে বাইতের ব্যাখ্যা পরে দেয়া হবে)।

২। বাংলা উচ্চারণ ঃ কুল লা-আছআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা" (সূরা শুরা, আয়াত- ২৩)

অর্থ ঃ "হে প্রিয় নবী; বলে দিন- আমি তোমাদের কাছে নবুয়তের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাইনা। শুধু আমার নিকটজনদের প্রতি মহব্বৎ কামনা করছি"। (হযরত আলী, বিবি ফাতেমা, হাসান-হোসাইন সহ হুযুরের নিকটজন)- হাকিম, আহমদ ও তাবরানী।

৩। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ফাকুল তায়ালাও নাদ্‌উ আব্‌না আনা ওয়া আব্‌নাআকুম ওয়া নিছা আনা ওয়া নিছা আকুম ওয়া আনফুছানা ওয়া আনফুছাকুম ছুম্মা নাব্‌তাহিল"। (সূরা আলে- ইমরান- ৬১ আয়াত)।

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "হে প্রিয় নবী! ঘোষণা করে দিন, হে নাসারাগণ- এসো। আমরা ও তোমরা নিজ নিজ সন্তানগণকে, স্ত্রীগণকে এবং নিজেদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। অতঃপর আমরা মোবাহালা করি।"

নোট ঃ খৃষ্টানদের সাথে উক্ত মোবাহালা বা মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ হয়েছিল।

৪। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ওয়া'তাছিমু বি-হাবলিল্লাহি জামিআওঁ ওয়ালা তাফাররাকূ"। (সূরা আলে-ইমরান ১০৩ আয়াত)।

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

সওয়ায়েকে মুহ্‌রিকা শরীফে আল্লাহর রজ্জু বলতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহলে বাইতকে বুঝানো হয়েছে।

৫। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ইউফুনা বিন নাযরি ওয়া ইয়াখাফুনা ইয়াওমান কানা শাররুহু মুছতাতীরা"। (সূরা দাহার- ৭ আয়াত)।

অর্থ ঃ "ওরা মানত পূরণ করে এবং ঐদিনের ভয় করে- যে দিনে বিপত্তি হবে ব্যাপক।"

হযরত আলী, ফাতেমা (রাঃ), হাসান ও হোসাইন রাদি আল্লাহু আনহু- এর শানে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

৬। উচ্চারণ ঃ "ওয়া ইজ গাদাওতা মিন্ আহলিকা তুবাউ ইবুল মোমিনিনা মাক্বাইদা লিল্ ক্বিতালি"। (সূরা আলে ইমরান- ১২১ আয়াত)।

অর্থ ঃ হে রাসূল! স্মরণ করুন- "যখন আপনি আপনার পরিবারবর্গের নিকট হতে অতি প্রত্যুষে বের হয়ে জেহাদের জন্য মুমিনগণকে যুদ্ধের ময়দানে বিন্যস্ত করেছিলেন"।

উহুদের যুদ্ধে যাবার সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) এর গৃহ হতে তিনি বের হয়েছিলেন। তাই বিবি আয়েশাকে উক্ত আয়াতে আহলে বাইত বলা হয়েছে।

হাদীস শরীফে আহলে বাইতের ফযিলত ও পরিধি ঃ

১। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি আল্লাহর নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে মহিলার সাথে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো- অথবা যার সাথে আমার সন্তানদের বৈবাহিক সম্পর্ক হবে, সে আমর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তবরানী, হাকিম- হযরত আবু হোরায়রা সূত্রে)

২। হুযুর পূরনূর (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করবে না- যতক্ষণ না সে আমার পরিবারবর্গ এবং আমার নিকটজনদেরকে- মহব্বৎ

www.sunnibarta.com

করবে"। অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ "কোন বান্দা আমার উপর প্রকৃত বিশ্বাসী বলে বিবেচিত হবেনা- যে পর্যন্ত সে আমাকে ভালো না বাসবে এবং ততক্ষণ আমাকে ভালোবাসার দাবী করতে পারবেনা- যতক্ষণ না সে আমার আহলে বাইতকে (পরিবারবর্গকে) ভালোবাসবে"। (ইবনে মাজা-হযরত আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত)।

৩। নবী করিম রাউফুর রাহিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহকে ভালবাস। কেননা তিনিই তোমাদেরকে আপন নেয়ামত দ্বারা খাদ্য সংস্থান করেছেন। আর আমাকে মহব্বৎ কর- আল্লাহর মহব্বৎ প্রাপ্তির জন্য এবং আমার আহলে বাইত বা পরিবারবর্গকে ভালবাস- আমার ভালবাসা প্রাপ্তির জন্য" (তিরমিজি ও হাকিম- ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত)।

৪। হুযুর আকরাম নূরে মোজাচ্ছাম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "তিনটি বিষয়ে তোমরা আপন সন্তানগণকে আদব শিক্ষা দিবে- (১) তোমাদের নবীর প্রতি মহব্বৎ (২) নবীর আহলে বাইতের প্রতি মহব্বৎ (৩) কোরআন মজীদ তিলাওয়াত"। (দায়লামী শরীফ)।

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ নবী করিম (দঃ) জীবন সায়াহ্নে এ কথা বলে গেছেন- "তোমরা আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমাকে তোমাদের প্রতিনিধি মানিও" (তাবরানী শরীফ)

৬। আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহর নিকট তিনটি সম্মানিত বস্তু রয়েছে- যারা এগুলোর সম্মান ও হেফাযত করবে- আল্লাহ তায়ালাও তাদের দ্বীন দুনিয়া-উভয়টির হেফাযত করবেন। আর যারা এগুলোর সম্মান ও হেফাযত করবে না, আল্লাহও তাদের দ্বীন-দুনিয়ার হেফাযত করবেন না"। আরয করা হলো- ঐ তিনটি বস্তু কি? হুযুর (দঃ) বললেন- "(১) ইসলামের হেফাযত ও সম্মান, (২) আমার সম্মান এবং (৩) আমার নিকটাত্মীয়গণের সম্মান" (তাবরানী ও আবুশ্ শাইখ)

৭। প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "কোন বান্দাই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না- যে পর্যন্ত আমি তার নিজের আত্মার চেয়েও বেশী প্রিয় না হবো এবং আমার আহলে বাইত তার পরিবার বর্গের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবে এবং আমার পরিবার তার পরিবারের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবে" (বায়হাকী ও দায়লামী শরীফ)।

৮। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সর্বদা একথা বলতেন ঃ "আমার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার চাইতে হুযুর আকরাম (দঃ) -এর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি বেশী সদ্ব্যবহার করাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়" (বুখারী শরীফ)।

www.sunnibarta.com

৯। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "আওলাদে রাসুলের (আলে মুহাম্মাদ) পরিচিতি দোযখ থেকে পরিত্রাণের উছিলা, আলে রাসুলের প্রতি মহব্বৎ পোষণ করা পুলসিরাত অতিক্রমের মাধ্যম এবং আলে রাসুলের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা আযাব থেকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি" (কাজী আয়াযের শিফা শরীফ)।

১০। হুযুর আকরাম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি আল্লাহর নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছি যে- আমার পরিবারবর্গের (আহলে বাইত) কেউ দোযখে যাবেনা"। (আবুল কাশেম ইমরান ইবনে হাসীন থেকে বর্ণিত)

১১। হাবীবে খোদা (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমার আহলে বাইতের সাথে যে যেরকম আচরণ করেছে- এর প্রতিদান আমি তাকে কেয়ামতের দিনে সেরকম দেবো" (ইবনে আসাকির- হযরত আলী সুত্রে বর্ণিত)

১২। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই আমার আহলে বাইত নূহ নবীর (আঃ) কিস্তির মত। যে ঐ তরীতে আরোহন করেছে- সে নাজাত পেয়েছে এবং যে বিরত রয়েছে- সে ডুবে মরেছে" (হাকিম- হযরত আবু যর সূত্রে বর্ণিত)।

১৩। হুযুর পুরনুর (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "ঐ ব্যক্তির উপর খোদার ক্রোধ আপতিত হোক- যে আমার আহলে বাইতকে জ্বালাতন করে ও কষ্ট দেয়। সে আমাকেও কষ্ট দেয়।" (দায়লামী- হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত)।

১৪। হুযুর পুরনুর (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন (রাঃ)- এর সাথে যুদ্ধ করে- আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং যে ওদের সাথে সন্ধি করে- আমিও তার সাথে সন্ধিবদ্ধ"। (তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকিম প্রমূখ)

১৫। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে আমার প্রতি, হাসান ও হোসাইনের প্রতি এবং তাদের মাতা-পিতার (ফাতিমা ও আলী) প্রতি মহব্বৎ পোষণ করে- সে জান্নাতে আমার সাথী হবে"। (তিরমিজি ও আহমদ- হযরত আলী সূত্রে)

১৬। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "কেয়ামতের দিনে বংশগত ও বৈবাহিক সুত্রের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে (কোন উপকারে আসবেনা)। কিন্তু আমার বংশগত বন্ধন ও বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হবে না। (উপকারে আসবে)" (ইমাম আহমদ ও হাকিম)।

১৭। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্পাক ফাতিমা ও তার সন্তানগণের জন্য দোযখ হারাম করে দিয়েছেন" (বাযযার- হযরত আবু ইয়ালা সূত্রে এবং তাবরাণী- ইবনে মাসউদ সূত্রে বর্ণিত)

www.sunnibarta.com

১৮। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি সর্বপ্রথমে আমার আহলে বাইতের জন্য সুপারিশ করবো, তারপর নিকটাত্মীয়দের জন্য" (তাবরানী শরীফ- হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত)

১৯। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কঠিন ক্রোধে পতিত হবে, যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিবে।" (দায়লামী শরীফ)

২০। নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "কেয়ামতের দিনে ঘোষণা দেয়া হবে- "হে হাশরবাসীগণ! মাথা নিচু করো, চোখ বন্ধ করো- ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (দঃ) পুলছিরাতের উপর দিয়ে গমন করবেন। অতঃপর ফাতিমা (রাঃ) সত্তর হাজার হুর পরিবেষ্টিত হয়ে বিদ্যুতের মত পুলছিরাত অতিক্রম করবেন।" (সাওয়ায়েকে মুহরিকা- আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী)।

আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবের সকল পবিত্র আহলে বাইত ও সকল সাহাবায়ে কেরামের মহব্বৎ আমাদের নসীব করুন- আমীন।

www.sunnibarta.com

দশম পর্ব

আহলে বাইত- এর সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হাককানী উলামায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম আলেম মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রঃ)- যিনি তাফসীরে নাঈমী, জাআল হক, শানে হাবীবুর রহমান, সালতানাতে মোস্তফা সহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন- তাঁর লিখিত আমিরে মুয়াবিয়া (রঃ) নামক গ্রন্থে তিনি "আহলে বাইত"- এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন- তা থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

তিনি বলেনঃ প্রথমে এটা বুঝা প্রয়োজন যে- নবী করিম (দঃ) -এর "আহলে বাইত" কারা এবং এর অর্থ কি?

"আহ্‌ল" একটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- ওয়ালা। "বাইত"- আর একটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- ঘর। সুতরাং "আহলে বাইত" এর একত্রে শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় "ঘর ওয়ালা"- অর্থাৎ একই ঘরে বসবাসকারী। ব্যবহারিক অর্থে ঘরের অধিবাসীদেরকে আহলে বাইত বলা হয়। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে সাধারণতঃ আহলে বাইত বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে 'আহল' শব্দটির ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন- আহলে এলম, আহলে দৌলত- ইত্যাদি।

"আল" আরেকটি আরবী শব্দ। এর অর্থও বংশধর বা পরিবারবর্গ। তবে "আহ্‌ল ও আল" দুটি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত কিছু পার্থক্য আছে। "আহল"- শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন- আহলে বাইত, আহলে এলেম, আহলে দৌলত, আহলে ফলানা- ইত্যাদি। কিন্তু "আল" শব্দটি শুধুমাত্র মানুষের বেলাতেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- আলে রাসুল- (রাসুলের বংশধর), আলে ইমরান- (ইমরানের বংশধর), আলে ফিরআউন- (ফেরাউনের অনুসারী ও খাদেম)।

পারিভাষিক অর্থে- পরিবার পরিজনকে সাধারণতঃ "আল" বলা হয়। আবার কোন কোন সময় বিশিষ্ট খাদেম ও অনুসারীগণকেও "আল" বলা হয়ে থাকে। যেমন- উপরে আলে ইমরান, আলে ফেরাউন ও আলে রাসুল তিনটি শব্দে দেখানো হয়েছে। "আলে রাসুল" বলতে অনুসারী এবং খাদেমকেও বুঝায়।

আহ্‌লে বাইত কারা?

এবার দেখা যাক- "আহলে বাইতে নবী" অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের অধিবাসীগণ। এবার প্রশ্ন আসে- ঘরের অধিবাসী বলতে কাকে বুঝায়? ঘরের অধিবাসী দুই প্রকার।

www.sunnibarta.com

যথা ঃ (১) নসব বা বংশগত সুত্রে ঘরের বাসিন্দা। যেমন, ছেলে ও মেয়ে (২) বৈবাহিক সুত্রে ঘরের বাসিন্দা- যেমন স্ত্রী। প্রথমটি আবার দুই প্রকার- (১) ছেলে (২) মেয়ে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার ছেলে- কাসেম, তৈয়ব, তাহের ও ইবরাহীম পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করে পিতৃগৃহেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু চার মেয়ে- জয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) পিতৃগৃহে জন্ম গ্রহণ করে পরে স্বামীগৃহে গমন করেছেন। হযরত যয়নব (রাঃ) আবুল আস (রাঃ)- এর ঘরে, হযরত রোকেয়া ও উম্মে কুলসুম (রাঃ) পর পর হযরত ওসমান (রাঃ)- এর ঘরে এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) সংসারে গমন করেছেন। তাঁরা উভয় দিকের "আহ্‌লে বাইত" -এর অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার- আহ্‌লে বাইতুছ ছুকনা বা বৈবাহিক সুত্রে ঘরের বাসিন্দা। উনারা হলেন- হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত সওদা (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সহ হুযুরের ১১ জন বিবি। তাঁদেরকেও "আহলে বাইতুন নবী ছুকনা" বলা হয়।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কেবলমাত্র পুত্র সন্তানগণই ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা বা স্থায়ী আহলে বাইত। মেয়েগণ প্রথমে পিতার ঘরের আহলে বাইত এবং পরে স্বামীগৃহেরও আহলে বাইত হয়ে যান। **সুতরাং হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর "আহলে বাইত" বলতে মূলতঃ চার ছেলে, চার মেয়ে ও এগার বিবিকেই বুঝানো হয়েছে।** তবে হযরত আলী (রাঃ) খাজা আবু তালেবের ছেলে হয়েও বিবি ফাতিমা (রাঃ)- এর স্বামী হওয়ার কারণে আহলে বাইত- এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন- নবীজির বিশেষ হাদীসের মাধ্যমে। হযরত আলী (রাঃ) শিশুকাল থেকেই হুযুরের ঘরে লালিত পালিত। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আবুল আস (রাঃ) জামাতা হয়েও তাঁরা আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন নি।

শিয়াদের মতে আহ্‌লে বাইত ঃ

শিয়াগণ শুধু বিবি ফাতিমা (রাঃ) এবং তাঁর দুই ছেলে- ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন এবং স্বামী হযরত আলী (রাঃ) কেই "একমাত্র আহলে বাইত" বলে স্বীকার করে। অন্য কাউকে স্বীকার করে না। হুযুরের অপর তিন সাহেবজাদী, চার সাহেবজাদা এবং এগার বিবিকে তারা আহলে বাইতের বহির্ভূত বলে মনে করে।

আহ্‌লে সুন্নাতের মতে আহ্‌লে বাইত ঃ

কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম ও উলামাগণ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াছ- এই চার দলীলের মাধ্যমে হুযুরের বিবিগণ, চার ছেলে, চার মেয়ে এবং জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কে "আহলে বাইত" বলে বিশ্বাস করেন। হাদীস দ্বারা প্রমাণীত অন্যদেরকেও আহলে বাইত বলে স্বীকার করেন। তবে হযরত বিবি ফাতেমা, ইমাম হাসান,ইমাম হোসাইন ও হযরত আলী (রাঃ)- এই চার জনকে সবার উপরে প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন। কেননা, ওনাদের উচ্চ মর্যাদা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

www.sunnibarta.com

এখানেই শিয়া ও সুন্নীদের আক্বীদার পার্থক্য। শিয়াগণ ইমাম হাসান (রাঃ) কে "আহলে বাইত" বলে স্বীকার করলেও তাঁর বংশধরগণকে "আহলে বাইত" বলে মানেনা। যেমন গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) হাসানী বংশ হওয়া সত্বেও শিয়ারা তাঁকে "আহ্লে বাইত" বলে স্বীকার করেনা।

উল্লেখ্য যে, শিয়াগণ পাক পাঞ্জাতন, আহলে রেদা, আহলে কাছা এবং আহলে আবা- বিভিন্ন নামে শুধু পাঁচজনকেই "আহলে বাইত" বলে। কিন্তু আহলে সুন্নাতের মতে আহলে বাইত- এর পরিধি ব্যাপক। তন্মধ্যে চাদর দ্বারা আবৃত পাঁচজনকে (হুযুর (দঃ), বিবি ফাতেমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন (রাঃ)) আহলে রেদা, আহলে কাছা বা আহলে আবা এবং পাক পাঞ্জাতন বলে পৃথকভাবে প্রাধান্য ও পৃথক সম্মান দিয়ে থাকেন। পাক পাঞ্জাতন হলেন খাস বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং আহলে বাইত হলেন আম বা ব্যাপক সংখ্যক নবী পরিবারবর্গ।

আরো উল্লেখ্য যে, বিবি ফাতিমা (রাঃ)- এর বংশধরগণই কেবল পরবর্তী কালে ও বর্তমানে আহলে বাইত এবং সৈয়দ খান্দান বলে বিবেচিত। হযরত আলী (রাঃ) আহলে বাইত- এর অন্তর্ভূক্ত হলেও তাঁর অন্য স্ত্রীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ কিন্তু "আহ্লে বাইত" ও "আওলাদে রাসুলের" অন্তর্ভূক্ত নহেন। তাঁদের উপাধী হলো আলভী। অন্য কোন লোক আওলাদে রাসুল বলে দাবী করলে জাহান্নামী হবে। হযরত আলীর অন্য বংশধর গণকে "আওলাদে আলী"- বলা হয় এবং ফাতেমার (রাঃ) গর্ভজাত সন্তানগণকে "আওলাদে রাসুল" বলা হয়ে থাকে। নসব পরিবর্তনকারী জাহান্নামী (আল হাদীস)। সুতরাং আওলাদে রাসুল হতে হলে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের বংশধর হতে হবে।

হুযুর (দঃ)- এর পবিত্র বিবিগণ "আহলে বাইত"- এর অন্তর্ভূক্ত ঃ

তাফসীরে কবীর, মিরকাত, আশিয়াতুল লোমআত- প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হক কথা হলো এই যে- হুযুর (দঃ)- এর ছেলে, মেয়ে ও পবিত্র বিবিগণ- সকলেই হুযুরের "আহলে বাইত"- এর অন্তর্ভূক্ত (কানযুল ঈমান ও খাযায়েনুল ইরফান দ্রষ্টব্য)।

হুযুর আকরাম (দঃ)- এর বিবিগণ যে "আহলে বাইতে নবুয়াত"- এর অন্তর্ভূক্ত- ইহা কুরআন মজিদ, তাফসীর ও অনেক সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণীত।

কুরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণ ঃ

১। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ওয়া ইয্ গাদাওতা মিন আহলিকা তুবাউ ইবুল মু'মিনীনা মাক্বাঈদা লিল্ ক্বিতালি" (আলে ইমরান ১২১ আয়াত)।

অর্থ ঃ হে প্রিয় রাসুল! স্মরণ করুন- যখন আপনি নিজ পরিবার (আহলে বাইত) এর নিকট হতে প্রত্যুষে বের হয়ে জিহাদের জন্য মুমিনগণকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করতে ছিলেন"।

www.sunnibarta.com

শানে নুযুল ঃ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখ ভোরে হুযুর আকরাম (দঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর ঘর হতে বের হয়ে মুসলমানগণকে নিয়ে উহুদের ময়দানে পৌছে তাঁদেরকে বিভিন্ন ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করেছিলেন। যুদ্ধ কৌশলে এই কাজটি ছিল অতি নিখুঁত। তাই আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধসফর ও ঘাটি স্থাপন কাজটিকে প্রশংসা করে এ আয়াত নাযিল করেছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত আয়েশা (রাঃ) কে হুযুরের আহলে বাইত বলেছেন। সুতরাং বুঝা গেল- আহলে বাইতে রাসুলের মধ্যে হযরত আয়েশাও (রাঃ) অন্তর্ভূক্ত।

২। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লি-ইউযহিবা আনকুমুর রিজ্ছা আহলাল বাইতি- ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা, "(সূরা আহযাব- ৩৩ আয়াত)।

অর্থ ঃ "হে নবী পরিবারবর্গ! আল্লাহ তায়ালা ইহাই চান যে, তোমাদের থেকে তিনি অপবিত্রতাকে দূরে রাখেন এবং তোমাদেরকে অতি উত্তমরূপে পাক পবিত্র করেন"।

শানে নুযুল ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরামা (রহঃ) বলেনঃ সূরা আহযাবের উক্ত আয়াত এবং পূর্ববর্তী ৩২ নং আয়াত দুটি নবী করিম (দঃ)- এর বিবিগণকে সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে- (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে জরীর)। 'আহলাল বাইতি' বলে নবীর বিবিগণকে সম্বোধন করা হলেও সমগ্র মুমিন নারীগণকে লক্ষ্য করেই তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন- "(৩২) হে নবী পত্নীগণ, তোমরা অন্যদের মত সাধারণ নারী নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে পুরুষদের সাথে এমন কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলোনা- যাতে অন্তরের দুষ্ট রোগে আক্রান্ত লোকের মনে কু-বাসনা জন্ম নেয়। তোমরা সঙ্গত ও সহজভাবে ভাল কথাবার্তা বলবে"। '(৩৩) (হে নবী পত্নীগণ)' তোমরা নিজেদের গৃহেই অবস্থান করবে এবং পূর্ববর্তী জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মত বেপর্দা হয়ে নিজেদেরকে প্রদর্শন করবেনা, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে। হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ্ তো এটাই চান যে, তিনি তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দুরে রাখবেন এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে ও উত্তমরূপে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দেবেন"। (সূরা আহযাব আয়াত ৩২ ও ৩৩)।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা ঃ নবী পত্নীগণকে সম্বোধন করে যদিও আল্লাহ তায়ালা উক্ত দুটি আয়াত নাযিল করেছেন এবং 'আহলাল বাইতি' বলে নবীর বিবিগণকেই মূখ্যতঃ পাক পবিত্র করার ওয়াদা করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে নারী জাতি এবং নবীজীর সমগ্র পরিবারবর্গ। সেজন্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরপর হযরত আলী, বিবি ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) গণকে ডেকে এনে নিজের গায়ের চাদরখানা দিয়ে তাঁদেরকে বেষ্টন করে এই

www.sunnibarta.com

দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! এরাও আমার আহ্‌লে বাইত বা আমার পরিবারবর্গ; হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে খুব পবিত্র করো" (ইবনে জারীর)।

সুতরাং কুরআনের "আহ্‌লাল বাইতি"- এর মধ্যে এই চারজনকেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামিল করে নিলেন। ইহাই আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও আক্বীদা (কানযুল ঈমান-ঈমাম আহমদ রেজা)। মোদ্দা কথা- "আহলে বাইত" বলতে যদিও পরিবারের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা- সকলকেই বুঝায়, কিন্তু আয়াতের ধারাবহিকতায় শুধু নবী পত্নীগণকেই "আহলাল বাইতি" বলে সম্বোধন করার কারণে উপরোক্ত চারজন বাদ পড়ার ধারণা আসার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই নবী করিম (দঃ) হাদীসের মাধ্যমে উক্ত ধারণা দূর করে দেন।

এখন নবী পরিবারের সকল সদস্যই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। ইহাই হক্ব ফায়সালা। ইহাই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা। এই আয়াতকে আয়াতে তাতহীর বলা হয় এবং চাদরে আবৃত হওয়ার কারণে উক্ত চার সদস্যকে (ফাতেমা, আলী, হাসান, হোসাইন) আলে আবা, আলে কাছা, আলে রেদাও বলা হয় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্রতা ঘোষণার কারণে হুযুর (দঃ) সহ চারজনের সকলকে "পাক পাঞ্জাতন" বলা হয়। এটা শুধু হাদীসের বৈশিষ্ট্যের কারনে। কিন্তু আয়াতের মর্মানুসারে হুযুরের বিবিগণসহ সকলেই আহ্‌লে বাইতও পাক পবিত্র-এর অন্তর্ভূক্ত। আয়াতের শানে নুযুল বাদ দিয়ে উক্ত চারজনকেই শিয়াগণ শুধু হাদীস দ্বারা "আহ্‌লে বাইত" বলেছে। এটা তাদের অপব্যাখ্যা। তবে পাক পাঞ্জাতনের মর্তবা অন্যান্য আহলে বাইতের মধ্যে সবার উর্দ্ধে।

৩। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ফালতাক্বাতাহু আলু ফিরআউনা লিয়াকূনা লাহুম আদুওয়াও ওয়া হাযানান" (সূরা আল-কাসাস ৮ আয়াত)।

অর্থ ঃ "অতঃপর ফেরাউনের ঘরের লোকেরা (আলে ফেরাউন) হযরত মুছা (আঃ) কে তুলে নিলো। মুছা ওদের শত্রু ও অশান্তির কারণ হবেন।"

ব্যাখ্যা ঃ "ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া নদী থেকে হযরত মুছা (আঃ) কে তুলে নিয়েছিলেন। হযরত মুছা (আঃ) পরবর্তীতে ফেরাউনের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন এবং ফেরাউনের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। উক্ত আয়াতে বিবি আছিয়াকে "আলে ফেরাউন" বলা হয়েছে। আল ও আহল শব্দদ্বয় স্ত্রীর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।" সুতরাং আমাদের নবীর বিবিগণও আলে রাসুলের অন্তর্ভূক্ত।

৪। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ফা-ক্বালা লি-আহ্‌লিহিম্‌কুছু ইন্নি আ-নাছ্‌তু নারান" (সূরা তোয়াহা ১০ আয়াত)।

অর্থ ঃ "হযরত মুছা আলাইহিস সালাম "স্বীয় আহলকে" বললেন- তোমরা অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখে আসি"।

www.sunnibarta.com

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতে হযরত মুছা (আঃ) আপন স্ত্রী ছফুরাকে ঐকথাটি বলেছিলেন। আল্লাহ পাক বিবি ছফুরাকে হযরত মূছা (আঃ) এর "আহ্‌ল" বলেছেন। বুঝা গেল-স্ত্রী স্বামীর আহ্‌লে বাইত।

৫। বাংলা উচ্চারণ ঃ "ফা-নাজজ্বাইনাহু ওয়া আহ্‌লাহু মিনাল কারবিল আযীম" (সূরা আম্বিয়া ৭৬ আয়াত)।

অর্থ ঃ "অতঃপর আমি ওনাকে (নূহ) এবং ওনার পরিবার পরিজনকে (আহলকে) বড় বিপদ থেকে নাজাত দিয়েছি।"

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ আলাইহিছ ছালামের মুমিন স্ত্রী ও মুমিন সন্তানকে যৌথভাবে তার 'আহল' বলে উল্লেখ করেছেন। বুঝা গেল- স্ত্রী ও সন্তান- সবাই নূহ নবীর "আহলে বাইতের" অন্তর্ভূক্ত।

৬। বাংলা উচ্চারণ ঃ ক্বালাত ইয়া ওয়াইলাতা আআলিদু ওয়া আনা আজুযুন ওয়া হাযা বা'লী শাইখা। ইন্না হাযা লাশাইউন আজীব। ক্বালু আতা'জাবীনা মিন্ আম্‌রিল্লাহি-রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম আহলাল বাইতি; ইন্নাহু হামীদুম্ মাজীদ"। (সূরা হুদ ৭২ আয়াত)।

অর্থ ঃ "(হযরত সারা) বললেন- কি আশ্চর্য! আমার সন্তান হবে? অথচ আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন! নিশ্চয়ই এটা অদ্ভুত ব্যাপার। ফিরিস্তাগণ বললেন- আল্লাহর কাজে কি আশ্চর্যবোধ করছেন? হে ইবরাহীমের ঘরের বাসিন্দাগণ (আহলে বাইত) আল্লাহর রহমত ও বরকত সমূহ তোমাদের উপরই রয়েছে। অবশ্যই তিনি যাবতীয় সৌন্দর্যের অধিকারী ও মর্যাদার অধিকারী"।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও বিবি সারা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে হযরত ইসহাক (আঃ)- এর জন্মের শুভ সংবাদ লাভ করেন। উক্ত ফিরিস্তারা হযরত লূত (আঃ)- এর এলাকা ধ্বংস করার জন্য যাওয়ার পথে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে এ শুভ সংবাদ দেন। তাঁর পাশেই স্ত্রী সারা দাঁড়ানো ছিলেন। ফিরিস্তাদের কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে উক্ত উক্তি করেছিলেন। ফিরিস্তারা জবাবে বিবি সারাকে লক্ষ্য করেই "আহ্‌লাল বাইতি" বা হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর পরিবার বলেছিলেন। বুঝা গেল- বিবিও স্বামীর "আহলে বাইতের" অন্তর্ভূক্ত।

উপসংহার ঃ উপরের ছয়টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো- শুধু ছেলে বা মেয়েকেই আহ্‌লে বাইত বলা হয় না; বরং স্ত্রীকেও আহ্‌লে বাইত বলা হয়। অতএব, নবী করিম (দঃ)- এর 'আহ্‌লে বাইত' বলতে শুধু আলী, ফাতিমা, হাসান, হোসাইনকেই বুঝায় না- বরং বিবিগণকেও বুঝায়- যেমনটি ঘটেছে সুরা আহযাবের ৩২-৩৩

www.sunnibarta.com

আয়াতের বেলায়। কিন্তু শিয়ারা হুযুরের বিবিগণকে আহ্‌লে বাইত স্বীকার করে না। এটা তাদের গোঁড়ামী।

আহ্‌লে সুন্নাতের মতে আহলে বাইত বলতে প্রথমতঃ বিবিগণকেই বুঝায়। সে সাথে তাঁদের সন্তানগণও আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভূক্ত হন। তবে জনগণের চর্চার কারণে এবং কতেকটা কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার কারণে "আহ্‌লে বাইত" বলতে প্রথমেই হযরত আলী, বিবি ফাতিমা ও ইমাম হাসান হোসাইনের (রাঃ) কথাই মানসপটে ভেসে উঠে। তাই জনগণ ""আহলে বাইত", বলতে প্রথমে ওনাদেরকেই বুঝে। তবে এই কথার অর্থ এ নয় যে- হুযুরের পবিত্র বিবিগণ মোটেই "আহলে বাইত" নন। এটা শিয়াদের জবরদস্তি এবং অপব্যাখ্যা মাত্র। কুরআন এবং হাদীসের কোথাও এ কথার উল্লেখ্য নেই যে, হুযুরের বিবিগণ "আহলে বাইতের" অন্তর্ভুক্ত নন।

হাদীসের দ্বারা বিবিগণের আহলে বাইত হওয়ার প্রমাণ ঃ

১। বাংলায় উচ্চারণ ঃ "মা-আলিমতু আলা আহলী ইল্লা খাইরান" (বুখারী শরীফ)।

অর্থ ঃ নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না"।

ব্যাখ্যা ঃ মুনাফিকরা যখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)- এর চরিত্রের উপর অপবাদ রটনা করেছিল, তখন গায়েবী এলেমের অধিকারী নবী করিম (দঃ) অহী নাযিলের পূর্বেই একদিন এরশাদ করলেন- "আমি আমার পরিবার (আয়েশা) সম্পর্কে ভালই জানি"- অর্থাৎ তাঁর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই"।

বুখারী শরীফের উক্ত বর্ণনার দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। যথাঃ

১) হুযুরের বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুরের "আহ্‌লে বাইত"। কেননা, হুযুর (দঃ) নিজেই তাঁকে আহ্‌লী (আমার আহ্‌লে বাইত) বলেছেন। হুযুরের বাণী অগ্রাহ্য করে শিয়াগণ শুধু ৪ জনকেই আহ্‌লে বাইত সাব্যস্থ করেছে। এতে তারা মারাত্মক ভ্রমে পতিত হয়ে গোম্‌রাহ হয়েছে।

২) মুনাফিক, বেঈমান ও নবী বিদ্বেষী ওহাবী- মৌদুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা নবীজীর অদৃশ্য বিষয়ের এলেম (ইলমে গায়েব) সম্পর্কে নিরীহ জনগণের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা অহরহ চালিয়ে যাচ্ছে যে- যদি তিনি ইল্‌মে গায়েব জানতেন- তবে এক মাস পর্যন্ত চুপ রইলেন কেন? আল্লাহর পক্ষ হতে অহী নাযিলের পূর্বেই তো তিনি বলে দিতে পারতেন যে- আয়েশার চরিত্রে কোন দোষ নেই। এতেই বুঝা যায়- নবীর ইলমে গায়েব ছিল না (নাউযুবিল্লাহ্‌)।

www.sunnibarta.com

তাদের এই কু-ধারণাকে বুখারী শরীফের উল্লেখিত বর্ণনাই মিথ্যা প্রমাণীত করছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে হুযুর (দঃ) সন্দেহাতীতভাবে পূর্বেই জানতেন। এজন্যই 'মা-আলিমুত আলা আহ্‌লী ইল্লা খাইরান'- অর্থাৎ "সন্দেহাতীতরূপেই আমি আমার পরিবারের উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে অবগত রয়েছি"- বলে পূর্বেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জানা সত্ত্বেও হুযুর (দঃ) নিজে মুনাফিকদের জওয়াব না দিয়ে বরং আল্লাহকে দিয়ে বিষয়টির সমাধান করে তিনি মহা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। এতে পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ চিরতরে দূরীভূত হয়েছে, মুনাফিকরা অপদস্ত হওয়ার সাথে সাথে খোদায়ী শাস্তির মুখোমুখী হয়েছে এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) "সিদ্দীকা" খেতাবে ভূষিতা হয়েছেন। তাঁর পবিত্র চরিত্রের ঘোষণা আসমানে জমিনে সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে। হুযুর (দঃ) নিজের ইলমে গায়েব দ্বারা ফয়সালা করলে উক্ত মহত্ব প্রকাশ পেতনা। আর ওহাবী মুনাফিকরা তখন হয়তো আরো একটি অপবাদ রটনা করতো যে- হুযুর (দঃ) আসল ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্যই আগেভাগে এরূপ করেছেন। তবুও তারা হুযুরের ইলমে গায়েব স্বীকার করতোনা।

বিশেষ অনুরোধ ঃ সুন্নী উলামাগণ বুখারী শরীফের এই হাদীসখানার ব্যাখ্যা ভালভাবে স্মরণ রাখলে ওহাবীদের মোকাবেলায় "ইলমে গায়েব" -এর মোনাযারায় অতি সহজেই তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন- লেখক।

উপসংহার ঃ মোদ্দা কথা হলো ঃ কুরআন সুন্নাহর দলিলাদি দ্বারা একথাই প্রমাণীত হলো যে, আহলে বাইত বলতে শুধু ছেলে- মেয়ে ও নাতী-নাতনীকেই বুঝায় না- বরং স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে- সকলকেই বুঝায়। নবী করিম (দঃ)- এর "আহলে বাইত" বলতে হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা সহ সকল বিবিগণ এবং চার পুত্র, চার কন্যা, ইমাম হাসান-হোসাইন ও হযরত আলীকেও বুঝায়।

এছাড়াও ঘোষণার মাধ্যমে হুযুর (দঃ) যাদেরকে "আহলে বাইত" বলেছেন- তাঁরাও নবী পরিবারের মধ্যে শামিল। এখানে যুক্তি তর্ক অচল। যেমনঃ শিফা শরীফে আহলে বাইত অধ্যায়ে কাজী আয়ায (রঃ) বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে- হযরত আব্বাস ও তার সন্তানগণ, হযরত আকিল ও হযরত জাফর শহীদ (রঃ) গণের পরিবারবর্গকেও নবী করিম (দঃ) "আহলে বাইত" ঘোষণা করে খোদার কাছে তাঁদের জন্য দোয়া করেছিলেন।

হযরত আব্বাস ও তাঁর সন্তানগণকে একদিন নবী করিম (দঃ) একটি চাদর দ্বারা আবৃত করে এই দোয়া করেছিলেন- "হে আল্লাহ! আব্বাস আমার চাচা এবং পিতৃতুল্য। এরা আমার "আহলে বাইত"। আমি আমার চাদর দ্বারা যেভাবে তাঁদেরকে আবৃত করেছি- তুমিও তদ্রূপ আপন রহমত দ্বারা তাঁদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচিয়ে রাখিও" (বুখারী শরীফ)।

www.sunnibarta.com

আহলে বাইত- এর বৃহৎ পরিসরে যাঁদের নাম প্রথমেই মানসপটে ভেসে উঠে- তাঁরা হলেন- হযরত বিবি ফাতিমা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং তাঁদের বংশধরগণ। কেননা তাঁদের বৈশিষ্ট্যই আলাদা। তাই বলে অন্যদেরকে আহ্লে বাইত বলে অস্বীকার করলে নবীজীকেই অস্বীকার করা হয়। ইহাই আহলে সুন্নাতের ইমামগণের মতামত।

শিয়াগণের বাড়াবাড়ি এবং তাদের অনুসারী ও অনুগামী কিছু সংখ্যক সুন্নী মুসলমানের বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ আমাদের ঈমান হেফাযত করুন এবং হুযুর পাক (দঃ)- এর সকল আহলে বাইত ও বংশধরগণের প্রতি মহব্বৎ নসীব করুন। খাস করে "পাক পাঞ্জাতনের" রূহানী ফয়েয ও বরকত নসীব করুন।

উলামাগণ মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রহঃ)- এর উক্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি বিশেষভাবে অনুধাবন করবেন বলে আশা রাখি- লেখক।

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

www.sunnibarta.com

একাদশ পর্ব

শেষ কথা ঃ

"শিয়া পরিচিতি" পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হলেও নির্ভরযোগ্য। শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (রহঃ) লিখিত "তোহ্ফা ইস্না আশারিয়া" ফার্সি গ্রন্থের আরবী অনুবাদ "আল মিন্হাতুল ইলাহিয়া" গ্রন্থ হতে সংক্ষিপ্তাকারে এই "শিয়া পরিচিতি" পুস্তিকাখানি সংকলিত হয়েছে।

মুঘল যুগে, বিশেষ করে সম্রাট আকবরের যুগে ভারতে শিয়াদের উৎপাত সরকারী আনুকুল্য পেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ ৫০ বৎসরের শাসনকালে সম্রাট আকবরের আমির উমারাহগণ শিয়া মতবাদ ও আচার আচরণকে সমাজে প্রচলন করে গেছেন। মুঘল উমারাহ আগা সাদেক, আগা বাকের বর্তমান বাংলাদেশে শিয়া আচার-আচরণ ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। শিয়াদের উক্ত বিদআতী কার্যকলাপ ও আক্বীদা বিশ্বাসের ভ্রান্তি থেকে সমাজকে উদ্ধার করার জন্য হযরত মুজাদ্দিদ আলফি সানী (রহঃ), শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহ্লভী (রহঃ), ইতিহাসবেত্তা আবদুল কাদির বদায়ুনী (রহঃ), মোল্লা দো পেয়াজা, সম্রাট আলমগীর, শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) প্রমূখ মনিষীগণ কলমী জিহাদ করে গেছেন। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি মকতুবাত শরীফ, মাদারিজুন নুবুয়ত, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও তোহ্ফায়ে ইস্না আশারিয়া- এর মত বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ সমুহ।

শাহ্ আবদুল আজিজের (রহঃ) পর শিয়া ফির্কার প্রভাব সমাজ থেকে অনেকটা দূরীভূত হয়। শিয়া সুন্নীর দ্বন্দ ও বিতর্ক থাকলেও শিয়ারা ছিল পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত। অধুনা শিয়া বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৭৯ ইং সালে ইরানে শিয়া হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা এর নাম দিয়েছে "ইসলামী ইরানী প্রজাতন্ত্র।" সেখানে সুন্নী মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শিয়াদের মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান ভিন্ন। অপরদিকে সুন্নীদের মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও কবরস্থান ভিন্ন।

ইরানী শিয়া বিপ্লবকে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে চালান দেয়ার জন্য ইরানী সরকার দেশে দেশে সাংস্কৃতিক কন্সুলেট খুলেছে। বাংলাদেশেও শিয়া তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। তাদের প্রচারের প্রথম শিকার হয়েছে- ওহাবীপন্থী উলামাগণ ও জামায়াতপন্থী ইসলামী চিন্তাবিদগণ। ক্বারী ওবায়দুল্লাহ- ইরানের বিপুল অর্থানুকুল্যে সর্বপ্রথম ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স হলে থানা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলন করে মক্কা

www.sunnibarta.com

শরীফের হজ্ব প্রথাকে "আধুনিক মেলা" বলে ঘোষণা দিয়েছিল এবং প্রতিনিধি নিয়ে ইরান সফর করেছিল। তার পূর্বে ১৯৮২সালে হাফেজ্জী, মাওঃ আজিজুল হক, আক্তার ফারুক, মাঃ ফজলুল হক আমিনী সহ- ওহাবী উলামাদের একটি প্রতিনিধি দল ইরান সফর করেন এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনীর পিছনে নামায আদায় করে আসেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশে ইরানী ষ্টাইলে বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে- জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা মাঃ দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ইরানের সাথে আঁতাত করেন। ইরানের অর্থানুকুল্যে তিনি প্রায়ই ইরান সফর করে থাকেন এবং সেখান থেকে প্রেরণা লাভ করে আসেন। এভাবে তাদের দেখাদেখি কিছু কিছু উলামা ও চিন্তাবিদ প্রলুব্ধ হচ্ছেন এবং শিয়াদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলছেন।

হালে বাংলাদেশে শিয়া মতবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অভাবী দেশের মানুষ সামান্য কিছু ভাতা পেলেই বিক্রি হয়ে যায়। সামান্য কিছু টাকা পয়সার বিনিময়ে তাই আলিমগণ তাদের ঈমান, আক্বীদাকে বিক্রি করে দিচ্ছে। এ কারণেই এদেশে ওহাবী, মওদুদী, তাবলীগী, কাদিয়ানী, বাহায়ী, শিয়া প্রভৃতি বাতিল মতবাদ শিকড় গাড়তে শুরু করেছে। জনগণ কিন্তু সুন্নী মুসলমান। সুন্নীদের থেকে বাগিয়ে নিয়েই এসব উপদল গঠিত হচ্ছে। কেউ জ্ঞাতে, কেউ অজ্ঞাতে, কেউ অর্থ লোভে; আবার কেউ ধর্মীয় উম্মাদনায় এসব দলে শরীক হচ্ছে। শিয়া ফিৎনার প্রেক্ষাপটেই অধমের বর্তমান এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ৮ই জামাদিউল আউয়াল ১৪১৬ হিজরী রোজ বুধবার অত্র পান্ডুলিপি লিখার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। অবশ্য এর পূর্বেও শিয়া বিপ্লবের উপর বাংলা ভাষায় কিছু বই বাজারে ছাড়া হয়েছে। আশা করি সুধী পাঠক এগুলোর দ্বারা উপকৃত হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়- বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওঃ ওবায়দুল হক ১৯৮১ইং সনে শিয়াদের বিরুদ্ধে বই লিখেও বর্তমানে তিনি তাদের গুনগানে মত্ত। জানিনা- এর পিছনে রহস্য কি? আল্লাহ্ আমাদেরকে সুন্নী নীতিতে অটল রাখুন। নূতন নূতন ফির্কা হতে আমাদের দূরে রাখুন। আমীন।

বিঃ দ্রঃ পাণ্ডলিপি অবস্থায় শিয়া পরিচিতি দীর্ঘ ১০ বৎসর পড়ে ছিল। ১৪২৬ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মোতাবেক ২০০৫ সালের জুন মাসে ইংল্যান্ডের কার্ডিপ অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী এবং মৌলভী বাজারের উত্তর মোলাইম নিবাসী জনাব সূরুক মিয়া তাঁর মরহুম পিতা ও মরহুমা মেয়ের রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে অত্র "শিয়া পরিচিতি" বইখানা প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তাঁর পিতা ও আদরের কন্যাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা নসীব করুন! আমিন!!

অধম লেখক

www.sunnibarta.com